ঐতিহাসিক প্রবন্ধ

শিক্ষা-বিজ্ঞান-প্রণেতা

শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্, এ

অধ্যাপক—রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ, কলিকাতা

কলিকাতা

১৫, কলেজ স্কোয়ার

চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং

১৯১২

মূল্য ১।০ সিকা মাত্র

ভূমিকা

[শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ,
প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার কর্ত্তৃক লিখিত]

অন্যদেশে মৃত্যুর পর প্রিয়জনকে সমাহিত করিয়া তাহার অবশেষ যথাসাধ্য রক্ষার চেষ্টা করে; ভারতবর্ষে প্রিয়জনকে চিতায় দগ্ধ করিয়া তাহার চিহ্নমাত্র রাখে না। তাহার জন্মকোষ্ঠী পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দেয়।

ভারতবর্ষের পক্ষে ভারতবর্ষ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছু ছিল না। অতীত ভারতবর্ষের সঞ্চিত ধন সমুদায়ই বর্ত্তমান ভারতবর্ষ লাভ করিয়াছে; কিন্তু তাহার জন্মকোষ্ঠী ও জীবনের কাহিনী ভুলিয়া গিয়াছে।

অন্যদেশে যাহাকে ইতিহাস বলে, এদেশে তাহা নাই। অতীতের তত্ত্ব এদেশ রাখিতে চাহে না। স্বদেশের অতীতকেই ভুলিয়া গিয়াছে; বিদেশের ত কথাই নাই। বিদেশের কোন সংবাদই কখনও রাখিত কি না, ভারতবর্ষের সাহিত্যে তাহার প্রমাণ নাই।

ইউরোপের কাছে এই বিদ্যাটা আমাদের শিখিবার ছিল। চতুষ্পাঠীতে এই বিদ্যার জন্য কখনও কাহারও কৌতূহল ছিল না, এখনও নাই। ইংরেজের স্থাপিত স্কুল কলেজে এই বিদ্যা শিখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। ইংরেজের নিকট আর যাহা শিক্ষণীয় থাক না কেন, এই বিদ্যা শিখিবার ছিল।

অর্দ্ধশত বৎসরের উপর হইল, ইংরেজি বিশ্ববিত্থালয় এদেশে স্থাপিত হইয়াছে। বিত্থালয়ের ছাত্রগণ ইতিহাসের গ্রন্থ অনেক মুখস্থ করিয়াছে। কিন্তু এই ইতিহাস বিত্থার প্রতি শ্রদ্ধা এখনও আমাদের মধ্যে আসে নাই। কি স্বদেশ কি বিদেশ, কোন দেশের ইতিহাস জানিতে আমাদের শ্রদ্ধার কোন প্রমাণ পাইনা। আমাদের ধাতে ইহা লাগে নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্যের এই ঘরটা একবারে শূন্য। খানকতক পাঠশালার পাঠ্য ইতিহাস আছে, না থাকিলেও চলিত। আজ কাল স্বদেশের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানে কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তির উদ্রেক দেখিতেছি। তাহাতে এখনও ফলের চেয়ে পল্লবের আধিক্য।

স্বদেশের ও বিদেশের অতীত কথার আলোচনা করিয়া তাহা হইতে শিক্ষালাভের চেষ্টা দেখি না। সেই অতীতের কথা আলোচনা করিতে ভাবুকের চিত্ত স্তম্ভিত হয়, দার্শনিকের চিত্ত দিশাহারা হয়, যাঁহারা মানবের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তায় ব্যাকুল তাঁহারা গন্তব্য ও কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে গিয়া হাবুডাবু খান।

এদেশে শিক্ষিত ব্যক্তিকে এজন্য ব্যাকুল হইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কেবল একটি উদাহরণ মনে পড়ে, সে স্বর্গগত ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি বিদেশের কাহিনী আলোচনা করিয়াছিলেন, স্বদেশের কথারও যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছিলেন, বিদেশের নিকট যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, স্বদেশের আলোচনায় তাহা প্রয়োগের চেষ্টা করিয়া গন্তব্য ও

কর্ত্তব্য নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে একটি আর একটি ভূদেব জন্মিল না। হায় বাঙ্গালা দেশ!

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীমান্ বিনয়কুমার সরকার উৎসাহশীল অধ্যবসায়শীল যুবা। ইঁহার অন্তরে আকাঙ্ক্ষা আছে ভাবপ্রবণ হৃদয়ে অনুরাগ আছে। এই তরুণ বয়সে ইহাঁর উদ্যমের পরিচয় পাইয়া আশার সঞ্চার হয়। ইনি স্বদেশের ও ও বিদেশের অতীত কথার আলোচনা করিতেছেন; সেই তুলনা-মূলক আলোচনায় যে উপদেশ পাওয়া যায়, তাহার অর্জ্জনে উদ্যম করিতেছেন। সেই উদ্যমের ফল এই ক্ষুদ্র পুস্তক।

পুস্তকখানি অতি ক্ষুদ্র, কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সমষ্টিমাত্র। প্রত্যেক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে একটা আকাঙ্ক্ষার ও আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইবে। পড়িয়া আমার আনন্দ হইয়াছে, আশা করি পাঠকগণও আনন্দিত হইবেন। ইতিহাসকে কেবলমাত্র ঘটনা-পঞ্জী মনে করিয়া যাঁহারা ইতিহাস আলোচনা করেন, তাঁহারা দুর্ভাগ্য। বহু সহস্রবৎসরের মানবজাতির মর্ম্মকথা ইতিহাসমুখে প্রকাশ পায়; মানবজাতিরূপ বিরাট্ পুরুষের হৃৎস্পন্দন ইতিহাস দ্বারা কর্ণগত হয়; সেই পুরুষের তপ্ত নিশ্বাস ইতিহাস মুখে বহির্গত হয়। স্থির-যৌবন মানব তাহার শত শতাব্দের বার্দ্ধক্য অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া যে ভূয়োদর্শনলব্ধ অভিজ্ঞতার বলে গুরুগম্ভীর উপদেশবাণী প্রচারিত করে, তাহা ইতিহাসের মুখেই শুনিতে পাই। সকলে শুনিতে পায় না। শুনিবার জন্ম শ্রবণেন্দ্রিয়কে প্রস্তুত করা আবশ্যক।

বিনয়বাবুর স্পৃহা ও উদ্যম ও অধ্যবসায় আছে। সেই উপদেশ-বাণী শুনিবার জন্য যদি কোন পাঠকের মনে কিয়ৎপরিমাণেও সেই স্পৃহা ও উদ্যম ও অধ্যবসায় এই পুস্তিকাদ্বারা সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে ইহার প্রচার ব্যর্থ হইবে না।

ফাল্গুন, ১৩১৮ শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

নিবেদন

এই প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাদের বিষয়সমূহের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও সকলগুলিতেই একটি বিশেষ আলোচনা-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিকের রীতিতে ইতিহাসালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে এই কয়টি সত্য আবিষ্কৃত হয়—

প্রথমতঃ, মানব কখনও কোন দেশেই সার্ব্বজনীন চরম সত্যের উপলব্ধি করে নাই। সকল যুগেই মানবসমাজ কালোপযোগী সমস্যার মীমাংসা করিয়া সাময়িক ও প্রাদেশিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, কোন জাতিই জগতে একেবারে স্বতন্ত্রভাবে ও সম্পূর্ণ স্বাধীন শক্তিরূপে বিকাশ লাভ করে নাই। জাতীয় চরিত্র ও ভাগ্য বিভিন্ন জাতির পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতেই গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনও এক জাতির উন্নতি-অবনতিতে সমগ্র বিশ্বেরই ভারকেন্দ্র স্থানান্তরিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

তৃতীয়তঃ, মানবের জীবনীশক্তি সর্ব্বত্র এবং সকল যুগে একই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া দেখা দেয় নাই। ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি সভ্যতার বিচিত্র অঙ্গে মানবজীবনের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু কোনও এক প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে সমগ্র জাতীয় জীবনই পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া যাইতে পারে।

ভারতীয় ইতিহাসের আলোচনায় এই কয়টি সত্যের প্রয়োগ আবশ্যক। তাহা না হইলে আমাদের দেশে ইতিহাসের অধ্যাপনা কার্য্যকরী হইতে পারিবে না এবং আমাদের জাতীয় ইতিহাস জীবন্তমূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইবে না।

আমাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রথমতঃ, ভারতীয় মানবের ইতিহাস এখনও তাহার শেষ অধ্যায় প্রকটিত করে নাই। দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য সমাজের ন্যায় ভারতীয় সমাজও (প্রাচীন ও মধ্যযুগে এবং বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত) সমগ্র বিশ্বের শক্তিপুঞ্জ অস্বীকার করিয়া পৃথিবীর একপ্রান্তে বিক্ষিপ্তভাবে একাকী বিকাশ লাভ করে নাই; তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনা যুগে যুগে বিভিন্ন কর্ম্মকেন্দ্র ও ভাবসমষ্টির অভ্যন্তরে বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য ও পারম্পর্য্য-রক্ষা করিয়াছে।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র ইংরাজী ও বাঙ্গালা ইতিহাসলেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন এবং 'বিশ্বকোষ' সম্পাদক ও 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়গণ এই গ্রন্থের প্রুফ-সংশোধনকালে স্থানে স্থানে ভাষাসম্বন্ধে আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

ফাল্গুন, ১৩১৮ শ্রীবিনয়কুমার সরকার

সূচী

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	স্থানে	শুদ্ধ
১৩	১৭	গতিরোধ	"	গতি
৮৯	৫	প্রতিষ্ঠার	"	প্রতিষ্ঠান
৮৯	৫	সংঘটনের	"	সংগঠনের
৯৩	৭	আশা	"	আশঙ্কা
৯৪	১১	পাইয়াছেন	"	পাইয়াছে

ঐতিহাসিক প্রবন্ধ

ইতিহাসের উপদেশ

ব্যক্তির জীবনের ন্যায় জাতীয় জীবনেও ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। জীবের জন্ম হয়—কৈশোর যৌবন জরায় সে অনেক কাজ করে, অনেক চিন্তা করে, তার পর মরিয়া যায়। জীবনে মরণে, অভ্যুদয়ে পতনে, নানা অবস্থার ভিতর দিয়া তাহার বিশেষত্বের বিকাশ হয়, তাহার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে। যে উদ্দেশ্যে তাহার সৃষ্টি, লোকসমাজের জন্য যে কর্ম্ম ও চিন্তা করিবার ভার তাহার উপর ন্যস্ত, পৃথিবীর যতটুকু কাজ করিতে সে উপযুক্ত সেই পরিমাণ কাজ করিতে পারিলেই তাহার জীবনের লক্ষ্য সফল হয়। এইরূপে তাহার মনুষ্যত্বের সম্যক্ বিকাশ করিতে হইলে তাহাকে অশেষ ঘটনা ও কার্য্যা-

ব্যক্তিগত জীবনের বিচিত্র অবস্থা, উন্নতি-অবনতি

বলীর মধ্যে পড়িতে হয়,—কোন সময় ফললাভ কিছু বেশী, কোন সময় হয়ত অল্প। কিন্তু দিনের পর দিন, অবস্থার পর অবস্থা, সুফলের পর কুফল, অথবা অসুবিধা-সুবিধা, বাধা এবং সাহায্যের ভিতরেই ক্রমশঃ তাহার কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে।

জাতীয় চরিত্রের অভিব্যক্তি

জাতীয় জীবনেও ঠিক সেই ভাব। প্রত্যেক জাতি অসংখ্য জাতি এবং সম্প্রদায়ের সংঘর্ষণে নানা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার কাজ করে; এই উপায়ে সমগ্র লোকসমাজের, সমস্ত মানব জাতির উদ্দেশ্যে তাহার যতটুকু দান করিবার আছে, ততটুকু দান করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং সফলতার অভিব্যক্তি করে। এই বৈচিত্র্য ও বিশেষত্বের বিকাশেই জাতীয় জীবনের সার্থকতা এবং ভগবানের অসীম ঐশ্বর্য্য ও মহিমার পরিচয়। তবে এই শেষ লক্ষ্য সাধনের পক্ষে অনেক দুর্য্যোগ সুযোগ উপস্থিত হয়,—সেই জন্য পৃথিবীতে যাবতীয় উন্নতি অবনতি। কিন্তু যে অবস্থার ভিতর দিয়াই হউক, অবশেষে জাতিগত চরিত্রেরই বিকাশ হইয়া থাকে।

ভগবান্ যে জন্য যে জাতিকে নিযুক্ত করিয়াছেন,

তাহারই পূর্ণতা হইতেছে। পারিপার্শ্বিক যত শক্তি ও ভাবসমষ্টি আছে তাহাদের অনুকূলতায় বা প্রতিকূলতায়, স্বকীয় শক্তির যে বিকাশ বা হ্রাস হয়, তাহাও বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মাধীন।

উত্থান ও পতন

জীবের জীবনে-মরণে যেরূপ, সমাজের অভ্যুত্থানে অধঃ-পতনেও সেইরূপ ভগবদিচ্ছারই কাজ হইতেছে। মৃত্যুতেই পুনর্জীবনের বীজ রহিয়াছে; মনুষ্য মরিয়াই বাঁচিতেছে,—পুনরায় নূতন জীবন আরম্ভ করিয়া নূতন উদ্যম ও নূতন সাহসে সেই জীবন-কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতেছে। সেই রূপ সমাজও এক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া নূতন কলেবরে সেই অর্দ্ধসমাপ্ত জীবনের কর্ম্ম শেষ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, অথবা অপরাপর সমাজকে তাহার উত্তরাধিকারী করিয়া দিয়া তাহাদের দ্বারা কর্ম্ম-সূত্রের দীর্ঘতা বৃদ্ধি করিতেছে।

অবস্থারই পরিবর্ত্তন হয়, অনুষ্ঠানেরই রূপান্তর দেখা যায়, ভাবের মৃত্যু হয় না;—চিন্তা অবিনাশী। যে কর্ম্ম রাশির মধ্যে ইচ্ছা বা চিন্তা প্রবেশ করিয়া স্থূল ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়, অথবা যে উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া আমাদের উদ্দেশ্য নিজকে প্রকাশিত করে, সেই কর্ম্ম বা উপলক্ষ্য, সেই আন্দোলন বা প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসে এবং

বিস্তৃতিতে, উন্নতি এবং অবনতিতে,—উভয়েই ভগবানের শক্তির এবং ইচ্ছার সফলতা হইয়া থাকে। অনন্ত মঙ্গলময়ের বিধানে মৃত্যু অবস্থান্তর মাত্র, অমঙ্গলজনক নয়। ব্যক্তির জীবনীর ন্যায় জাতীয় চরিত্রের ইতিহাস ও এই উপদেশ প্রদান করে। উন্নতি-অবনতি, পতন-উত্থানের মধ্যে সমাজ ভগবানের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছে।

ইতিহাসের আলোচ্য বিচিত্র আন্দোলন

সমাজ-জীবনের বিবরণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকে। জাতিগত চরিত্রের উন্নতি-অবনতি, চিন্তা ও কর্ম্মস্রোতের পরিবর্ত্তন, ভাব-গঙ্গার জোয়ার-ভাটা, সামাজিক জীবনের অশেষ কর্ম্মক্ষেত্রে অসংখ্য আকার ধারণ করে। রাজ-নৈতিক আন্দোলন, প্রজাশক্তির অভ্যুত্থান, ভাষা বা সাহিত্যের বিকাশ, বিজ্ঞানের উন্নতি, ধর্ম্মের প্রভাববৃদ্ধি, অথবা অজ্ঞান, অন্ধকার, অধর্ম্ম অত্যাচার, দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ, প্রজা-পীড়ন, রাজ্যধ্বংস—ইত্যাদির কাহিনী যে ইতিহাস তাহা একপ্রকার নীতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র। ইতিহাসের বিষয়ীভূত এই নানাপ্রকার ব্যাপারের মধ্যে ভগবানের হাত দেখা যায়।

প্রথমতঃ, ভিন্ন ভিন্ন জাতির জীবনে ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পন্ন হওয়ায় ঈশ্বরের অসীমতার এবং বৈচিত্র্য-সৃষ্টির

চিহ্ন প্রদর্শিত হইতেছে। এই বিশাল নরসমাজের মধ্যে এক একটি সম্প্রদায় বা জাতি এক একটি অঙ্গের স্থায় নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া অনন্ত জ্ঞানীর কার্য্য-বিভাগের শৃঙ্খলা ও নিয়মের পরিচয় দিতেছে; এবং এই উপায়ে সকলের সমবেত চেষ্টায় এক প্রকাণ্ড বিশ্বসভ্যতা, বিশ্বসাহিত্য এবং বিশ্ববিজ্ঞান সৃষ্ট হইয়া তাঁহার অসীম শক্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তেমনই অপরদিকে, এই সুশৃঙ্খলা, সুবন্দোবস্ত এবং বিশ্বমানবের ক্রমিক উন্নতি-বিকাশের প্রণালীর মধ্যে সত্য ও অসত্যের যত দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, বিজ্ঞানালোকে অজ্ঞানান্ধকারে যত বিরোধ হয়, যত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কলহ আসিয়া জুটে, যত মতভেদ, অনৈক্যের গোলমাল হয়,যত উৎপাত, উপদ্রব ও পীড়নের অবতারণা হয়, সমস্ত ঘুচিয়া যাইয়া মহাসত্যের বিকাশ, মহাদেশ ও মহাজাতির সৃষ্টি এবং প্রকৃত ধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও আন্তরিক ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ হইয়া বিধাতার চরমমঙ্গল বিধান খ্যাপন করিতেছে। তাহাতে সত্যেরই জয়, অসত্যের পরাজয়, অবিশ্বাসের নাশ এবং বিশ্বাসের সামর্থ্য, "যতো ধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ", এবং মিথ্যা ও অবিদ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী—এই উপদেশের, এই তত্ত্বের প্রচার হইতেছে।

ফলতঃ, ইতিহাস জাতীয় জীবনের কেবলমাত্র উন্নতি-অবনতির ছবি বা প্রতিকৃতি নয়, এই উন্নতি অবনতির মধ্যে যে ঐশী শক্তির, যে অসীম জ্ঞানের ক্রিয়া হইতেছে, তাহারও পরিচায়ক। ভগবানের উদ্দেশ্যে কাজ করিতে যাইয়া, তাঁহারই প্রেরিত লোকসমাজ যত প্রকার সাহিত্য, বিজ্ঞান, যত প্রকার কাব্যমাহাত্ম্য, যত প্রকার ধর্ম্ম ও স্বার্থত্যাগের নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে, অথবা যত প্রকার অধর্ম্ম পাশবিকতা, সন্দিগ্ধচিত্ততা এবং ক্ষুদ্রত্বের অভিনয় দ্বারা কষ্ট ও অত্যাচারের কারণ হইয়া বিদ্যা ও সভ্যতার প্রতিবন্ধক হইতেছে, এই সমস্ত ব্যাপারের পারম্পর্য্য ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধের কথা, ইতিহাসই হউক বা সমাজ-নীতিই হউক, ধর্ম্মশাস্ত্রেরই এক অধ্যায়।

ইতিহাসে ধর্ম্ম-তত্ত্ব ও নীতিকথা

আর, বাস্তবিক, যে ইতিহাসে এই ভগবৎপ্রেরণার উল্লেখ নাই, অথবা সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও বিনাশের যে বিবরণ পাঠ করিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্যের প্রতি মন আকৃষ্ট না হয়, অথবা ধনসম্পদের বৃদ্ধি বা হ্রাসের যে কাহিনীতে এই পার্থিব জীবনের অস্থায়িত্ব এবং বৈষয়িক উন্নতির অকিঞ্চিৎকরতার উপদেশ পাইয়া নিত্য অবিনাশী

ইতিহাসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আত্মার উৎকর্ষ সাধন দ্বারা ভগবানের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিবার জন্য চিত্তের ব্যাকুলতা না জন্মে, সেই আখ্যায়িকা কেবলমাত্র মারামারি কাটাকাটির বা কল-কারখানার কোলাহল অথবা কুসংস্কারপূর্ণ বাহ্যাড়ম্বরের অন্তঃসারশূন্য বিবরণ মাত্র। তাহাতে মানুষের আত্মার কথা নাই, মানুষের হৃদয়ের উল্লেখ নাই, মানুষের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধের কোন চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না, মানুষের গন্তব্যস্থান কোথায়, কি উপায়ে কতদিনে তাহার লক্ষ্য সাধিত হইবে, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। স্থূলদৃষ্টিতে বাহ্যজগতের যতটুকু দেখা যায়, তাহার কতকগুলি অসম্বদ্ধ কথা আছে মাত্র,—অন্তর্জগতের, শ্রদ্ধাভক্তি প্রেমের কোন উল্লেখ নাই। সেই আংশিক সত্যে জগতের নিয়ম বুঝা যায় না, জীবতত্ত্ব পরিষ্কারভাবে মনে স্থান পায় না। প্রকৃত ইতিহাসে সমাজের সকল প্রকার পরিবর্ত্তনের মধ্যে ভগবানের ইচ্ছা প্রকাশ হইতেছে, এই শিক্ষা দান করিয়া মহাসত্যের ক্রমবিকাশের নিয়মগুলি চোখের সম্মুখে ধরিয়া দেয়, এবং এই উপায়ে মানুষের কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া জীবনের পথপ্রদর্শক হয়। ইহাতে ভগবানের সঙ্গে মানুষের নৈকট্য স্থাপিত হয়, মানুষ বিধাতার ইচ্ছার সঙ্গে একমত

হইয়া বিশ্বের মঙ্গলজনক কর্ম্মে সহায়তা করিতে পারে।

মানবের ইতিহাস প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্ব-জীবন-বিষয়ক একটি মহা-নাটক

বাস্তবিক, নরসমাজের ক্রমোন্নতির উপদেষ্টা যে ইতিহাস-বিজ্ঞান, তাহা মানবজাতির নৈতিক জীবন-বিষয়ক একটী মহান্ নাট্য-কাব্য। এই পৃথিবী এক বিশাল রঙ্গক্ষেত্র। এই মঞ্চে মানুষ বাল্য যৌবন জরা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অভিনয় করিয়া চলিয়া যায়। ব্যক্তিগত জীবনের নাটক বিভিন্ন ব্যক্তি এবং অপর সকল শক্তির সঙ্গে আদান প্রদানে সমাপ্ত হয়। ইহার এক একটী দৃশ্য এবং অঙ্ক এই উপায়েই বিকশিত ও অভিনীত হইয়া থাকে। মানব-সমাজের চিত্র যে নাটকে অঙ্কিত হয়, তাহার চরিত্র এক একটী জাতি, এবং অভিনয় ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক আন্দোলন। জাতির সম্মিলনে এবং আন্দোলনের সংঘর্ষণে যে কর্ম্মের ও চিন্তার উদ্রেক হয়, তাহারই ক্রমবিকাশে এই কাব্যের পূর্ণতা। নাটকের ব্যক্তিগণ যেমন নিজে নিজের কর্ম্ম শেষ করিয়া নাটক-কারের রচনাকে সম্পূর্ণ করিতে সহায়তা করে, এবং এই উপায়ে তাঁহার মূল উদ্দেশ্যকে ফুটাইয়া তুলে, সেইরূপ, পৃথিবীতে যত সমাজ বা জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, প্রত্যেকেই,

নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা জগতের জ্ঞান ও সভ্যতা ভাণ্ডারে স্বীয় দাতব্যদান করিয়া অপরের সহায়তা করে এবং এই উপায়ে বিশ্ববিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ করে। এই বিশ্ব-নাটকের দৃশ্য ও অঙ্কগুলি বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসের এক এক পরিচ্ছেদ।

কাব্যে সদসতের দ্বন্দ্ব

কবি তাঁহার কল্পিত চরিত্র ও ভাবের সমাবেশে কোনও একটী সত্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। সেই সত্য দ্বন্দ্ব, বিরোধ, প্রতিযোগিতা অথবা মিলন, সহানুভূতি এবং সৌহার্দ্দ প্রভৃতি ভাব ও ঘটনার পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া পরিশেষে লোকের উপলব্ধি হয়। কবির বিচারে ন্যায়ের কৃতকার্য্যতা এবং অত্যাচারীর দণ্ড, প্রেমের জয় এবং হিংসাদ্বেষের পরাজয় ইত্যাদি পারিবারিক, নৈতিক এবং সামাজিক জীবনের সত্যগুলি সাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিশ্ব-কবি-রচিত এই মহান্ নাট্য গ্রন্থে অনেক সময়ে পাপের আস্ফালন, নাস্তিকতার অপ্রতিহত গতি, ও সয়তানের অবাধ রাজ্যভোগ দেখা যায় বটে; কিন্তু সমস্তই মঙ্গলময়ের ইচ্ছার অধীন বলিয়া, এই সব অসত্য, অবিদ্যা, মোহ-তিমিরই ভবিষ্যৎ উন্নতির এবং সত্যের পথ পরিষ্কার

করিয়া দেয়। মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাস, এইরূপ আলোক ও অন্ধকার, পাপ ও পুণ্য, বর্ব্বরতা ও সৌজন্য, ইত্যাদির বিরোধ রূপ অসত্যের ভিতর দিয়া বিকশিত হইতেছে।

ইতিহাস-নাট্যে ধর্ম্মোপদেশ ও নীতিপথ প্রদর্শন

ক্রমশঃ বিজ্ঞান, নীতি ও ধর্ম্মের রাজ্য বিস্তৃত হইতেছে, ক্রমশই লোক পরোপকার, স্বার্থত্যাগ, এবং ভগবদ্ ভক্তির পথে অগ্রসর হইতেছে, ক্রমশঃই বাহ্য ও মনোজগতের নিয়মগুলি মানুষ করতলগত করিতেছে, এবং মানুষের কাজ ও চিন্তার মধ্যে জাতীয়তা, প্রজাতন্ত্র-শাসন, সামাজিক জীবনে শ্রমজীবীদের উচ্চতর প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ভাবে বিচিত্ররূপে উন্নতির পন্থা পরিষ্কার হইতেছে। কিন্তু উন্নতির প্রত্যেক ধাপেই এক একটী সংগ্রাম, সভ্যতার প্রত্যেক স্তরেই মানুষকে মঙ্গল ও অমঙ্গল, বিদ্যা ও অবিদ্যার দ্বন্দ্ব সমন্বয় করিতে হইতেছে। শুভ এবং অশুভের এই চিরন্তন বিবাদ ঘুচাইয়া দিয়া মনুষ্যসমাজ ক্রমে শুভের পথেই যাইতেছে এবং মঙ্গলেরই জয় ঘোষণা করিতেছে বলিয়া সভ্যতার ইতিহাস একটী বিশ্ব-নীতিমূলক মহা-নাটক। ইতিহাসের প্রতি পর্য্যায়ে, জাতির সঙ্গে জাতির প্রত্যেক আদান-

প্রদানে, প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে এবং প্রত্যেক স্বাধীনতার আন্দোলনে "অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়"—শ্রুতির এই বচন কার্য্যে পরিণত হইতেছে বলিয়া এই নাটক ধর্ম্মগ্রন্থেরই এক অংশ।

কিন্তু এজগতে কেন যে অমঙ্গল, অসত্যের সৃষ্টি হয় বলা কঠিন। ভগবান যা করেন, সবই মঙ্গলের জন্য, তবে এত অহঙ্কার, এত অনৈক্য, এত স্বার্থ সিদ্ধির প্রবৃত্তি কেন? এত দাসত্ব পরাধীনতা কেন? অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারই মনকে অনেক সময় ভরিয়া রাখে কেন? এক একটী ফুল ফুটিতে বা প্রাণীর সৃষ্টি হইতে অসংখ্য জীবের নাশ হয় কেন? এই সকল প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেওয়া অসম্ভব। কোন উত্তরই শেষ পর্য্যন্ত মীমাংসার সহায় হইতে পারেনা। হয়ত এক মঙ্গলবিধানই চিরকাল একভাবে থাকিলে অমঙ্গলজনক হইয়া সংসারে ও সমাজে ঘোরতর অনিষ্ট করে, শুভই পরে অশুভের কারণ হয়। এক যুগে যাহা শুভ, অবস্থার পরিবর্ত্তনে পরবর্ত্তী যুগে তাহাই বিষময় ফল প্রদান করিতে থাকে; আবার তাহার সংশোধন না হইলে চলে না। অথবা কোন এক সম্প্রদায় বা ব্যক্তি কিছুকাল নরসমাজের উপকার করিয়া যে শক্তি বা অধিকার

অসতের উৎপত্তি

প্রাপ্ত হয়, পরে সেই অধিকারের এবং প্রভুত্বের অহঙ্কারেই অত্যাচার ও ব্যভিচার করিতে আরম্ভ করে। তখন অধিকারের এবং শক্তির পুনরায় বিভাগ বাঞ্ছনীয় হয়।

যে কারণেই হউক, অমঙ্গল, অসত্য আসিয়া জুটে। আমরা তাহাদের পূর্ব্বাপর অবস্থামাত্র দেখিতে পাই এবং ক্রমান্বয় ও পারম্পর্য্যই বর্ণনা করিতে পারি, তাহাদের মূল কারণ অবধারণ করিতে পারি না। এই এই অবস্থার পর এই এই ঘটনা হওয়ায় এই এই হইয়াছে, অথবা কোন সমাজ পূর্ব্বে জ্ঞানে ধর্ম্মে উন্নত ছিল, পরে অধর্ম্মে মূর্খতায় একেবারে ডুবিয়া রহিয়াছে, অথবা অমুক স্থানে অনেক দলাদলি গৃহবিবাদের পর জাতীয় ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে, ইত্যাদি কতকগুলি ঘটনা ও চিন্তার পৌর্ব্বাপর্য্য মাত্র আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি। অধীনতার ভিতরে শিক্ষা করিয়া কেন সমাজকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়, অথবা মানুষ কেন সয়তানের পরামর্শে কিছুকাল চলিবার পর ভগবানের উদ্দেশ্যে, প্রকৃত সুখের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা বলা যায় না।

আমাদের শাস্ত্রে পাপপুণ্য দুইই ভগবানের ইচ্ছায়

অধীন—দুইই ভগবানের সৃষ্টি, দুইই সনাতন এবং বিশ্বের সৃষ্টিকালাবধি জগতে বর্ত্তমান। তবে তাঁহারই বিধানে, তাঁহারই ব্যবস্থায় সত্য এবং পুণ্য দ্বারা মিথ্যা এবং অসত্য, সর্ব্বদা পরাজিত হইয়া, ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় ও বিস্তৃতিতে সহায়তা করে। জ্ঞান এবং ধর্ম্মের গতি অনেক সময় বাধাপ্রাপ্ত হয় বটে, দুষ্টের প্ররোচনায় অনেক সময় মন কুসংস্কারে পূর্ণ হইতে পারে বটে, এবং মায়াজালবদ্ধ হইয়া চিত্ত অনেক সময় স্বাধীনতা হারায় বটে, কিন্তু সংসারে পাপের আধিপত্য অল্প কয়েকদিনের জন্য, অচিরেই অধর্ম্মের রাজ্য লুপ্ত হইয়া যায়। বর্ষাকালে নদীর জলবৃদ্ধি একেবারেই ক্রমাগত হইতে থাকে না, কিছুদিন বৃদ্ধির পর হঠাৎ হয়ত দুই চার দিন কিছু হ্রাসই হয়, কিন্তু তার পর আবার বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপে হ্রাসের পর বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধির পর হ্রাস হইতে হইতে শেষ পর্য্যন্ত নদী বৃদ্ধির দিকেই চলিতে থাকে। তেমনি পুণ্যের গতিরোধ কখনই সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত হইতে পারে না। রোমীয় সাম্রাজ্যের ক্রমবিস্তার মাঝে মাঝে দুটা একটা যুদ্ধে পরাজয় এবং ক্ষণিক বিফল প্রয়াসের

সদসতের সম্বন্ধ

মধ্য দিয়াই সম্পন্ন হইয়াছিল। পৃথিবীতে জ্ঞান এবং ধর্ম্মের সাম্রাজ্য, পাপ ও অবিদ্যার দ্বারা মাঝে মাঝে হতশ্রী হইলেও, কখনই বিনষ্ট হইবার নহে; বরং অজ্ঞান এবং অধর্ম্মকে পদানত করিয়া সর্ব্বত্র প্রসারিত হইতেছে।

এই জন্য বিশ্ববিধাতার নিয়মে অত্যাচার, অবিচার, অন্যায়, মায়া, মূর্খতা, গোলামী এবং সন্দিগ্ধচিত্ততার ভিতর দিয়াই জীবন গড়িয়া তুলিতে হয়।

বিবিধ সয়তান সৃষ্টি

বিষ্ণুবৈরী হিরণ্যকশিপু ভগবানেরই কাজ করিতেছিলেন,—ঈশ্বর স্বয়ংই তাঁহার স্রষ্টা। ব্রহ্মার বরেই বলীয়ান্ হইয়া দৈত্য হিরণ্যকশিপু এত অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

যত দৈত্যদানব অসুর প্রভৃতি দেবদ্বেষী সমাজের কথা আমরা জানি, প্রত্যেকেই ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহারই কাজ করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল। কংসের উপদ্রব ভগবানের অবিদিত ছিল না। আবার দেবগণ যখন রাবণের উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া উদধিতীরে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন, ভগবানের সেই সময়কার কথায়ও বুঝা যায় যে, যাহাকে আমরা অমঙ্গল ও অশুভ বলি, পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গীন হিতসাধনের জন্য তাহারও প্রয়োজন

আছে। রাবণ বিধাতাকে সন্তুষ্ট করিয়া এরূপ বরলাভ করিয়াছিল যে, কোনও দেবতা তাহাকে নিধন করিতে পারিবেন না। তাই তাহার এত বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। এই জন্য ভগবান্ স্বয়ং দাশরথি হইয়া তাহার উচ্ছেদের কারণ হইলেন।

মানবজাতির ইতিহাসোলোচনায় দূর দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন

এই উপায়ে সমস্ত অমঙ্গলই ভগবানের কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মানুষের সসীম জ্ঞানের পরিধি অতি অল্প বলিয়া দূর ভবিষ্যতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার শক্তি নাই,—এজন্য সম্পূর্ণভাবে সকল-দিক্ নিরীক্ষণ করিতে পারা যায় না। একটী নাটক আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই কোন্ সত্য প্রচারের জন্য কবি অভিনয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন বুঝা যায়, কিন্তু বিশ্বকবিবরের কোন্ মহামন্ত্র জগতের ইতিহাসরচনার মূলে, সভ্যতার শেষ অঙ্ক কোথায়, শেষ দৃশ্যে কোন্ সত্য, কোন্ বিদ্যা প্রচারিত হইয়া কোন্ অসত্যকে দলন করিবে, তাহা অবধারণ করা অসম্ভব। অসীম অনন্তশক্তির পরিচয় পাইতে হইলে কত যুগান্তরের সৃষ্টি দেখিতে হইবে, কত বিশ্বের লয় দেখিতে হইবে, কত জাতির পতনোত্থান দেখিতে হইবে, জানা নাই।

যে দুএক দৃশ্য স্মৃতিপথে আছে বা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্যের পর বৃহত্তর সত্যের বিকাশ হইয়াছে দেখা যায়,—এবং তাহা হইতে এই মাত্র অনুমান করা যায় যে ক্রমশঃ মহাসত্যের বিকাশ ও উন্নতির পথে মানবজাতির চিন্তা ও কর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

বিপ্লব

মহাপুরুষের কার্য্য অসত্যনাশ ও যুগ-প্রবর্ত্তন

জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে ইতিহাসের প্রবর্ত্তক যে দুই চারিজন ব্যক্তি অধর্ম্মের এবং অবিদ্যার বিনাশ করিয়া ধর্ম্মের এবং জ্ঞানের গণ্ডী বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মহাপুরুষ ভাবে আমরা পূজা করিয়া থাকি।

সমাজের ব্যক্তিগণের মধ্যে যত চিন্তা ও কর্ম্মের আদান প্রদান হয়, সমস্তই এই পাপ ও পুণ্য, মিথ্যা ও সত্যের দ্বন্দ্ব সমন্বয় করিয়া সত্য এবং বিজ্ঞানের বিস্তৃতিই করিতেছে। সর্ব্বদা সকল স্থানেই এই বিরোধ এবং এই সমন্বয় চলিতেছে। প্রত্যেক মানুষই এক একটী বীর, অসত্যের পরাজয় করিয়া সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জগতে প্রেরিত হইয়াছে। প্রত্যেকেরই এই কার্য্য। তবে অনেক সময়ে সমগ্র পৃথিবীর বা সমস্ত জাতির চরিত্রই অবিশ্বাস, অহঙ্কার, নাস্তিকতা এবং পার্থিব সুখপ্রিয়তার দিকেই ধাবিত হয়। সেই সময়ে "ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ" "অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য" হইয়াছে বলা যায়—সমাজে শৃঙ্খলা আর নাই—দুষ্টের পালন এবং শিষ্টের দমন

হইতেছে, সর্ব্বত্র অবিচার অন্যায় চলিতেছে। এরূপ সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্ম্ম বিপ্লবের সময় যে দুই একজন কাণ্ডারী আসিয়া দেশতরণীকে প্রকৃত সত্যের পথে চালাইতে সমর্থ হন, তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে আমরা বীর বা মহাপুরুষ বা ক্ষণজন্মা ব্যক্তি বলিয়া থাকি।

মহাপুরুষ ও মানবসমাজ

তাঁহাদেরই মধ্যে ভগবানের শক্তি বিশেষ ভাবে বিদ্যমান, তাঁহারাই বিশ্বনিয়ন্তার পরিচিত প্রিয়জন। তাঁহারা তাঁহাদের কর্ম্ম, চিন্তা বা প্রেমের দ্বারা ঝড়তুফানের সময় শান্তি, শৃঙ্খলা এবং ভক্তি বিস্তার দ্বারা অসুরের রাজ্য ধ্বংস করিয়া দেবতার রাজ্য গড়িয়া তুলেন, খণ্ডসত্যের স্থানে মহাসত্যের আবিষ্কার করেন, ক্ষুদ্রস্বার্থ সমাহিত করিয়া জাতীয়তার সৃষ্টি করেন। এরূপ অলৌকিক শক্তির প্রভাবে তাঁহারা বিশেষ ভাবে ভগবানের লোক বলিয়া অবতার নামে খ্যাত হন। সমাজ এবং ধর্ম্ম তাঁহাদের অন্তর্ধানের পরে যে পথে চলিয়া থাকে সে পথ তাঁহাদেরই কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাঁহাদের পরবর্ত্তী সমাজ যে ভাবে জ্ঞানার্জ্জন, সাহিত্যানুশীলন, ধর্ম্মচর্চ্চা, নৈতিক জীবন গঠন, পারিবারিক

এবং সামাজিক কার্য্যকলাপ প্রভৃতি সকল প্রকার চিন্তা ও কর্ম্মের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া চলেন, তাহা সেই মহাপুরুষ বা ক্ষণজন্মা ব্যক্তিগণের পন্থা দ্বারা প্রবর্ত্তিত, এবং সেই যুগ তাঁহাদের নামে অভিহিত হয়।

এই জন্য বীরের জীবনীই জাতীয় ইতিহাস, কারণ পূর্ব্বাপর সমস্ত বীরগণের কার্য্যের সন্ধান যদি আমরা পাই, তাহা হইলে অনায়াসেই বীরপ্রসূ জাতির সমস্ত কার্য্যকলাপের বিবরণ আমাদের হস্তগত হয়। বীরগণের জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী সমাজের সমস্ত ঘটনা জানিতে পারা যায়। কোন্ সময়ে কোন্ সত্যের আবিষ্কার, কখন কোথায় কোন্ ভাবের লোপ হইল ইত্যাদি ভাব ও কর্ম্মের ক্রমবিকাশের সূত্র ধরিতে পারা যায়।

মহাপুরুষ ও জন-সাধারণ

অবশ্য প্রকৃতিপুঞ্জের চিন্তা ও কর্ম্ম প্রণালীর ইতিহাস যে একেবারে নগণ্য ইহা হইতে তাহা বুঝা যায় না। বীরেরা সাধারণ জনসমাজের নেতা এবং শিক্ষক, নূতন আলোক লইয়া আসিয়া তাঁহাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবার উপায়, নূতন সত্যের আবিষ্কারকর্ত্তা। কিন্তু সাধারণ সমাজ যদি একেবারে

স্পন্দনহীন অচেতন পদার্থ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই শিক্ষাদান বিফল হয়। সেই জন্য সকলকে সেই শিক্ষার অধিকারী করিয়া লওয়াও তাঁহাদেরই কাজের মধ্যে পরিগণিত। আর এ উপায়ে মহাপুরুষেরা সাধারণ লোকের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের স্বভাব এবং অভাবের অনুরূপ কর্ম্ম ও চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করেন বলিয়াই তাঁহাদের জীবন-চরিত পাঠ করিলে তৎকালীন সমগ্র সমাজের বিবরণ পাওয়া যায়। বীরের সঙ্গে সাধারণ জন-সমাজের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকিলে তাঁহাদের কাজে জগতের মঙ্গল বেশী হইত না এবং তাঁহারা যুগপ্রবর্ত্তক হইতে পারিতেন না। সাধারণ লোক-সমাজ বিজ্ঞান এবং সভ্যতার উন্নতির ভিত্তিস্বরূপ মহাপুরুষগণকে অনুগমন করিবার উপযোগী শক্তি বহন করে, সেই জন্য সেই জনসমাজের মধ্যে তাঁহাদের যশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

এই কারণে জগতের ইতিহাস একদিকে যেমন বীরদেরই বীরত্ব-কাহিনী, অপরদিকে জন-সাধারণেরও অভ্যুত্থানের কথা। সত্যপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কর্ম্মী কেবল বীরেরাই নহেন; সাধারণ লোকেরাই ইহার প্রধান অবলম্বন।

জগতের ইতিহাস সর্ব্বদা এক ভাবে চলে না। বিশ্বনাটকের কোন এক অঙ্ক বা দৃশ্য অপর কোন অঙ্ক বা দৃশ্যের অনুরূপ নয়। অবস্থাভেদে কার্য্য ও চিন্তার এবং বিদ্যাভ্যাস ও ধর্ম্মানুশীলনের ব্যবস্থার বিভিন্নতা হইয়া থাকে। সেই জন্য লোকসমাজের এবং বীরপুরুষদের কার্য্যও দেশ কাল পাত্রানুসারে পৃথক্। এক এক সময় এক এক কাজের জন্য ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন লোক প্রেরিত হন। অসত্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকার ধারণ করে,—কখনও প্রজাপীড়ন এবং অরাজকতা, কখনও অসাম্য এবং সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা, কখনও নাস্তিকতা এবং যথেচ্ছাচার। এই ভিন্ন ভিন্ন রকমের অসত্য নাশ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের প্রয়োজন। এজন্য পৃথিবীতে যত বিপ্লব, যত যুগান্তর, যত প্রলয় হয়, প্রত্যেকটাই ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচে ঢালা। কোন দুই "রিভ-লিউসনের" আকৃতিও প্রকৃতি একরূপ নয়।

বিপ্লবসমূহের বিভিন্নতা

আর বাস্তবিক পৃথিবী অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল। জগতের, কি বাহিরের, কি ভিতরের অবস্থার স্থিরতা নাই। সর্ব্বদা রূপান্তর হইতেছে, ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া বিশ্ব নূতন আকার

বিপ্লবের প্রকৃত তত্ত্ব

ধারণ করিতেছে। সেই জন্য পৃথিবীতে হঠাৎ কোন এক বিপ্লব হয় না। যাহাকে আমরা বিপ্লব বলি, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ক্রমবিকাশ। অনেক দিনের চেষ্টার ফলে, অনেক শক্তির সমুচ্চয়ে, অনেক কর্ম্ম ও চিন্তার স্বাভাবিক আন্দোলনে যুগান্তরের সৃষ্টি হয়। তবে অনেক সময়ে ঘটনাস্রোত ও চিন্তার পূর্ব্বাপর অবস্থা এবং কার্য্যকারণ সম্বন্ধ জানা থাকে না, এই কারণে বিশ্বব্যাপী কয়েকটা আন্দোলনকে বিপ্লব বলা হইয়া থাকে। এই যে ডিমক্রেসী, সায়েন্স, সোশ্যেলিজম্ ইত্যাদি কর্ম্ম ও চিন্তা-প্রণালীর অভ্যুদয় আজকাল জীবনের সমস্ত ব্যাপারেই লক্ষিত হয়, তাহা অনেক শতাব্দীর অনেক অধিকারচ্যুতি, অবিচার, উৎপীড়ন, কুসংস্কার প্রভৃতির বিনাশসাপেক্ষ বহু সমবেত চেষ্টার অবশ্যম্ভাবী ফল।

কয়েকটি ঐতিহাসিক বিপ্লব আলোচনা

যাহা হউক আন্দোলনসমূহ সময়োপযোগী, এজন্য বিচিত্র রূপে উপস্থিত হয়। গ্রীকজাতির অভ্যুদয়কালে রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে শাসনপ্রণালীর সংস্কার উদ্দেশ্যে যে যে আন্দোলন হইয়াছিল, অথবা চিন্তাজগতে সত্য আবিষ্কারের যে যে প্রচেষ্টা হইয়াছিল, সেই সব আন্দোলন রোমের

আন্তর্দ্দেশিক সংগ্রাম বা রোমীয় সাম্রাজ্যের পতন এবং ধ্বংসরূপ যে মহাবিপ্লব হইয়াছিল, তাহাদের মত নয়। আবার মধ্যযুগে পোপের অত্যাচার এবং কুসংস্কার ও মূর্খতার বিরুদ্ধে ভেরী নিনাদিত হইয়া নবীন যুবকদিগকে যে নূতন ধর্ম্ম, নূতন সাধনা, নূতন শিক্ষা এবং নূতন কর্ম্মপ্রণালীর জন্য জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে রণবেশে সজ্জিত করিয়াছিল, তাহাও অন্য কোন বিপ্লব বা আন্দোলনের অনুরূপ নয়। এইরূপে ইংলণ্ডের গৃহবিবাদ, রাজাপ্রজার কলহ, এবং কনষ্টিটিউসন্যাল আন্দোলন, ফরাসীদেশের রাজ্যবিপ্লব এবং প্রজাশক্তির অভ্যুত্থানের সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

প্রত্যেকটিই ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষ্যের মধ্য দিয়া ভিন্ন ভিন্ন আদর্শে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

বিপ্লবসমূহের বিভিন্ন লক্ষ্য

কর্ম্মীদের স্বভাব ও চিন্তা এক এক সময়ে এক এক লক্ষ্যদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। কোন বিপ্লব প্রধানতঃ ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, ধর্ম্মজীবনের উন্নতিই উহার মূল-উদ্দেশ্য, ঈশ্বরে বিশ্বাস আনয়নই প্রধান লক্ষ্য। কোন কোন সময়ে শিল্পবাণিজ্যের এবং অর্থসম্বন্ধীয় উন্নতিকল্পেই জাতীয় শক্তির স্ফূর্ত্তি হয়। কখনও রাজাপ্রজার সম্বন্ধের উন্নতিবিধান করিয়া রাষ্ট্রীয়

সমস্ত ব্যাপারে প্রজার অধিকার স্থাপনই প্রধান লক্ষ্য থাকে। কখনও বা সমাজসংস্কার, যোগ্যতানুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে অধিকার বিভাগ, এবং সমাজে মান ও খ্যাতির সুবিধা সৃষ্টি ইত্যাদিই লোকের চিন্তার বিষয় হয়। কখনও বিদ্যাশিক্ষার প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনই প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া থাকে।

বিপ্লবের আনুষঙ্গিক ফল

অবশ্য মানুষের সমস্ত চিন্তা ও কর্ম্ম যখন পরস্পর সম্বদ্ধ, তখন ধর্ম্মের উন্নতি বা অবনতিতে, অথবা ধন-সম্পদের হ্রাসে বা বৃদ্ধিতে সমাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং অপরাপর সকল বিষয়েই উন্নতি অবনতিও অবশ্যম্ভাবী এবং স্বাভাবিকই বটে। ফরাসীবিপ্লবে কেবল প্রজাতন্ত্র শাসনের প্রতিষ্ঠা হয় নাই,—ভাষা, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, সমাজ প্রত্যেক বিষয়েই স্বাধীন-চিন্তার ঢেউ, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের আন্দোলন আসিয়া আঘাত করিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্মের আন্দোলন কেবল ধর্ম্মজীবনেরই উৎকর্ষ বিধান করে নাই, তাহার ফলে রাজার কর্ত্তব্য, জাতীয় ঐক্য, বিদ্যা-শিক্ষা, জাতির সঙ্গে জাতির আদান প্রদানের নিয়ম, পদ্ধতি, ইত্যাদি সকল বিষয়ই রূপান্তরিত হইয়া নূতন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। উইক্লিফ, লুথার, ক্র্যান্মার

প্রভৃতি ব্যক্তিগণ কেবল ধর্ম্মবীর নন, তাঁহারা সমাজসংস্কারক এবং নূতন শিক্ষার প্রবর্ত্তকও ছিলেন। ভল্টেয়ার ও রুসো প্রভৃতি কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনমাত্রের প্রধান অবলম্বন ছিলেন না, চিন্তা-জগতে,—শিক্ষাবিজ্ঞান এবং জড়বিজ্ঞান, সমাজনীতি এবং সাহিত্য সম্বন্ধেও অধিকার তাঁহাদের বেশ ছিল।

———

গ্রীক ও হিন্দু

সকল সভ্যতার মধ্যে মানবের এক একটী আদর্শের অভিব্যক্তি হইয়াছে। মানব বিশ্বকে যে ভাবে দেখিয়াছে, বিশ্বের সহিত নিজের সম্বন্ধ এবং ইহার মধ্যে নিজের স্থান বিষয়ে যেরূপ ধারণা করিয়াছে, তাহার সভ্যতার মধ্যে সেই ভাব ও ধারণার প্রকাশ হইয়াছে।

প্রাচীন গ্রীসের বিশেষত্ব; রাষ্ট্রের সামাজিক জীবন-বিকাশেই ব্যক্তিগত জীবনের সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা

প্রাচীন গ্রীক-সমাজের প্রকৃত জীবনী শক্তি রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নিহিত ছিল। রাষ্ট্রের উন্নতি অবনতিতেই জাতীয় উন্নতি অবনতি সাধিত হইত। রাষ্ট্রের পুষ্টিসাধনই প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্য ছিল। রাষ্ট্রীয় জীবনেই সকলে নিজ নিজ সত্তা অনুভব করিত। কোনও গ্রীকই স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত ভাবে রাষ্ট্রাতিরিক্ত জীবন অতিবাহিত করিত না। রাষ্ট্রের সামাজিক জীবন-প্রবাহের মধ্যেনিজ নিজ ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন করিয়া জাতীয় উন্নতিসাধন করাই প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, বিধি নিষেধ, সমস্তই রাষ্ট্রের মঙ্গলের দ্বারা পরিচালিত হইত। তাহারা শিক্ষালাভ

করিত—সমাজের উপকারের জন্য। তাহারা সাহিত্যচর্চ্চা করিত, সঙ্গীত শিক্ষা করিত,—রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে সহায়তা করিবার জন্য। শিল্পী, কবি, গায়ক, লেখক, ভাস্কর, যোদ্ধা, পণ্ডিত প্রভৃতি সকলেই সাধারণতন্ত্রের বিবিধ উপকার সাধন করিবার জন্য নিজ নিজ শক্তির প্রয়োগ করিতেন; এবং রাষ্ট্রকে বিচিত্র উপায়ে সুসজ্জিত ও ভূষিত করিবার যোগ্যতা লাভ করিবার জন্যই নিজ নিজ বিশেষ শক্তির বিকাশের জন্য চেষ্টিত হইতেন। সাধারণের কর্ম্মে সময় দান করিতে না পারিলে, অথবা এতদুপযোগী শক্তির অভাব বোধ করিলে, তাঁহারা জীবন ব্যর্থ হইল মনে করিতেন।

বস্তুতঃ, রাষ্ট্রের উন্নতি সাধন করিতে যাইয়াই গ্রীকেরা ন্যায়শাস্ত্র, শব্দশাস্ত্র, গদ্য সাহিত্য, সমালোচনা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিদ্যায় অধিকারী হইয়াছিল। তাহাদের ওজস্বিতা, তাহাদের শিল্পনৈপুণ্য, তাহাদের কলাবিদ্যা, তাহাদের কারুকার্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়ই রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাষ্ট্র তাহাদের ধর্ম্ম, সমাজ, ব্যবসায়, সাহিত্য, চিন্তাপদ্ধতি প্রভৃতি জীবনের সকল বিভাগই নিয়ন্ত্রিত করিত। ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রের নিয়মপালনই চরম লক্ষ্য মনে করিয়া জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিত।

এই সভ্যতার মৌলিক কারণ,তাহাদের বিচিত্র সৌন্দর্য্যবোধ—স্বাতন্ত্র্যের বিনাশ

এইরূপে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনসমূহ বিশাল সামাজিক জীবনের মধ্যে নিমজ্জিত করাই তাহাদের নীতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল ; তাহার প্রধান কারণ এই যে,তাহারা সকল বিষয়েই সৌন্দর্য্য এবং সামঞ্জস্যের আদর করিত। এই সৌন্দর্য্যলিপ্সা,তাহাদের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বাহ্যসুন্দর ও অন্তঃসুন্দর ব্যক্তিগঠনের উপায় উদ্ভাবনের কারণ হইয়াছিল। এই সামঞ্জস্য ও সৌষ্ঠব-প্রিয়তাই তাহাদিগকে মন্দিরপ্রতিষ্ঠায়, মূর্ত্তিগঠনে, চিত্র-কর্ম্মে ও বিবিধ স্থাপত্যকার্য্যে অনুপ্রাণিত করিত। এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহারা সঙ্গীত চর্চ্চা করিত। এই জন্যই মানবশরীরের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মানবচিত্তের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশসাধনই তাহাদের লক্ষ্য ছিল। এই জন্যই তাহারা ব্যক্তিগত জীবনের কার্য্য ও চিন্তাসমূহকে এক কেন্দ্রে পরিচালিত করিয়া পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধপ্রতিষ্ঠা দ্বারা জীবনের সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা প্রদান করিবার চেষ্টা করিত। তাহারা সঙ্গীতবিদ্যাকে অন্তরঙ্গের ব্যায়াম মনে করিত, এবং উহার দ্বারা চিত্তের অসামঞ্জস্য ও বৈসাদৃশ্য দূরীভূত করিয়া সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তা প্রদান করিতে উৎকণ্ঠিত হইত। এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাই তাহাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক জীবন-

প্রিয়তার মূল। এই জন্যই তাহারা সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ জীবনগুলি রাষ্ট্রের সাধারণ জীবনের এক লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত করিয়া পরস্পারের মধ্যে ঐক্য, সামঞ্জস্য ও অঙ্গাঙ্গিভাব আনয়নের প্রয়াসী হইত। ইহার ফলে তাহারা রাষ্ট্রের সাধারণ উন্নতিতেই আপন আপন সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করিত।

প্রাচীন গ্রীসে ইহজগতের কর্ম্মক্ষেত্রই বিশ্বরূপে বিবেচিত হইত। গ্রীকেরা মানবজীবনকে এই ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ভাবে দেখিত এবং এই কর্ম্মক্ষেত্রেই এক জন্মের মধ্যে নিজ নিজ জীবনের সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিত। সুতরাং তাহাদের দৈনিক জীবনের সঙ্কীর্ণতা ও অসম্পূর্ণতার মধ্যে যে স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও অনৈক্য দেখিতে পাইত, সেই সমুদয়ের সমন্বয় সাধন করিবার জন্য তাহারা বৃহত্তর পার্থিব ঐক্যের অনুসন্ধান করিয়া উহার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যসমূহ বিসর্জ্জন করিত। এই কারণে বৈচিত্র্যসমূহের উচ্ছেদ সাধন করিয়া সামঞ্জস্যবিধানই তাহাদের সৌন্দর্য্যবোধের প্রধান অঙ্গ হইয়াছিল। এই বিচিত্র সৌন্দর্য্যবোধই গ্রীক সভ্যতার বিবিধ অঙ্গ অনুরঞ্জিত করিয়াছে। তাহাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রাধান্য, শিল্পে আকৃতিসৌষ্ঠবের

গৌরব, সঙ্গীতচর্চ্চার আদর এবং শিক্ষাপদ্ধতিতে ব্যায়াম ও সঙ্গীতের প্রভাব এই সৌন্দর্য্যবোধেরই পরিচায়ক। সকল বিষয়েই তাহারা অনৈক্য দূরীভূত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে।

ভারতবর্ষে যে সভ্যতা ও শিক্ষা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার বীজমন্ত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রাচীন ভারতের মতে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের বিসর্জ্জন সৌন্দর্য্যের লক্ষণ ছিল না। ভারতবর্ষ এক বিচিত্র সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি করিয়াছিল।

প্রাচীন ভারতের বিশেষত্ব (১) ব্যক্তির মধ্যে নিখিলের উপলব্ধি, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের লাভ

এখানে প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মার সম্পূর্ণ বিকাশই বিশ্বসৌন্দর্য্যের এক মাত্র লক্ষণ ছিল। সমাজের সাধারণ জীবনে ব্যক্তিগণের বিচিত্র জীবনধারাসমুহ নিমজ্জনের দ্বারা সকল প্রকার স্বাতন্ত্র্যের বিনাশ সাধন না করিয়া ভারতবর্ষ প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিদিনকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনপ্রবাহের মধ্যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের, বিশ্বজগতের এবং বিরাট্ ঐক্যের উপলব্ধি করিতে প্রয়াসী হইয়া সর্ব্বত্র স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যের রক্ষা ও পুষ্টি সাধন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। বর্ত্তমান নগণ্য জীবনের সামান্য কর্ম্ম ও চিন্তাসমূহের মধ্যে মহান্

(২) ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বিকাশ

অনন্ত যুগযুগান্তব্যাপী জন্মমরণাতীত ভবিষ্যতের মহত্ত্ব এবং ঐশ্বর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া সসীমকে অসীমের, অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণতার, অবিদ্যাকে বিদ্যার, মৃত্যুকে অমৃতের ও বন্ধনকে মুক্তির মহিমা দান করিয়াছিল। সকল পরবশতায় যে দুঃখের উৎপত্তি সেই মহৎ আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি করিয়া স্বাধীন আত্মবশতায় যে সুখের উৎপত্তি হয়, সেই স্বাধীনতা এবং মোক্ষলিপ্সাই সংসারের সকল কর্ম্ম ও ভোগের নিয়ন্তা এবং শেষ লক্ষ্যরূপে বর্ত্তমান ছিল। এই জন্য ভারতবর্ষে মানব বর্ত্তমান সামান্য অবস্থার মধ্যে অন্তর্নিহিত সমস্ত ভবিষ্যতের সহিত যোগ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া নিজ নিজ স্বতন্ত্র উপায়ে বিকাশ লাভে পরমানন্দ ও অমৃতের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিত।

এই সসীম ও বৈচিত্র্যের মধ্যে অসীম ও ঐক্যের উপলব্ধিই তাহাদের বিচিত্র ধর্ম্মভাবের কারণ। এ জন্যই তাহারা প্রত্যেক আত্মার ক্রমিক উন্নতি-লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহারই ফলে ভারতবর্ষে মানবের দেবত্ব সম্বন্ধে ধারণা পরিস্ফুট হইয়াছিল, এবং মানবসমাজের ক্রমিক বিকাশের মধ্যে পশুত্বের ক্ষয় হইয়া দেবত্বের অভিব্যক্তি হয়, সভ্যতার ইতিহাসে ধর্ম্মেরই

ধর্ম্মে এই ভাবের প্রবেশ (১) ব্যক্তিত্ববিকাশে জীবনের সার্থকতা ও মুক্তি (২)পরকালবাদ— প্রত্যেক ব্যক্তির মুক্তি

ক্রমবিকাশ হয়, এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই জন্যই প্রাচীন ভারতবাসীরা পরকালবাদ স্বীকার করিয়া, আত্মার মুক্তিলাভের ক্রমিকতা স্বীকার করিয়া, মুক্তিলাভ সম্বন্ধে জীবের বিচিত্র স্থিতি স্বীকার করিয়া, এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন আধ্যাত্মিক স্তরে অবস্থান স্বীকার করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, ও সম্পূর্ণ মুক্তিলাভের আশা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

সমাজে এই ভাবের প্রবেশ—অধিকারিভেদে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য লাভের সুবিধা

সুতরাং তাহাদের বৈচিত্র্যের মর্য্যাদারক্ষার প্রবৃত্তি ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল, এবং এই বিশিষ্ট ধর্ম্মভাবই সমাজজীবনে প্রবিষ্ট হইয়া সমাজকে আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদের সাধারণ সভ্যতাকে ইহজগতের ক্ষুদ্র গণ্ডীর অতীত করিয়াছিল। ইহারই ফলে তাহারা সমাজের বিচিত্র শ্রেণীবিভাগ, অধিকারবিভাগ, কর্ত্তব্য-বিভাগ এবং জাতি বিভাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বিদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সম্পূর্ণতালাভের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়া দিয়া প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায় হইতে পারিয়াছিল। এই স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও পরম সত্যের উপলব্ধিই তাহাদিগকে প্রত্যেকের অবস্থা-

নুসারে পরিপূর্ণতাদানোপযোগী বিচিত্র রীতিনীতি, বিচিত্র বিধিনিষেধ, বিচিত্র আশ্রমবিভাগ, বিচিত্র কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ঘোর অনৈক্য ও জটিলতার সৃষ্টি করাইয়া সমাজের মধ্যে মহান্ বিশ্ববৈচিত্র্যের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই তাহারা বিবাহপদ্ধতিতে, শ্রাদ্ধের কার্য্যকলাপে, অতিথিসৎকারে বিশ্বজগৎকে এবং যুগযুগান্তকে প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইয়া বিশাল, উদার ও মহান্ করিয়া তুলিত।

এই জন্যই তাহাদের সমাজপদ্ধতিতে ব্যক্তির স্থান সকলের উচ্চে ছিল। ভারতবর্ষ বুঝিয়াছিল প্রত্যেক ব্যক্তির এমন এক অবস্থা আছে, এমন এক প্রবৃত্তি আছে, যাহা সমাজনিয়ন্ত্রিত করিতে অনধিকারী,যাহার উপর পরিবারের কোন আধিপত্য নাই,যাহা রাষ্ট্রীয় জীবনের অতীত।

ব্যক্তির স্বাধীনতা রাষ্ট্রের আয়ত্ত নহে

প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যে বিরাট্ ঐশ্বর্য্য নিহিত আছে তাহার সার্থকতা উপলব্ধি করিবার জন্য তাহাকে সংকীর্ণ এবং অসম্পূর্ণ রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের অনায়ত্ত এক স্বাধীন অবস্থা উপভোগ করিতে হয়।

এই স্বাধীনাবস্থার ক্রমিক পরিস্ফুটতায় এবং এই স্বাধীনতার উপলব্ধিতেই ব্যক্তির বিকাশ, আনন্দ ও মুক্তি।

ইহাতেই জীবনের সফলতা, মনুষ্যত্বের সার্থকতা,—মানবের দেবত্বপ্রাপ্তি। সুতরাং ব্যক্তির জীবনের চরম উৎকর্ষ-সাধনই ভারতবর্ষের আদর্শ হইয়াছিল। এই সত্যের উপলব্ধি করিবার ফলেই তাহারা ব্যক্তির উপর রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের অধিকার খর্ব্ব করিয়া ব্যক্তিকে সকলের ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়াছিল। এজন্যই তাহারা ব্যক্তির জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ করিয়া সেই চরম লক্ষ্য সাধনের উপায় স্বরূপ রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের সহিত ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

চরমে মুক্তিলাভোপযোগী চারি আশ্রম বিভাগ—শিক্ষাপদ্ধতির ভিত্তি

এ জন্যই তাহারা ক্রমশঃ কর্ম্ম, ভোগ, সংসার ও প্রবৃত্তির ভিতর দিয়া জীবনের এক এক অবস্থায় ত্যাগ, সন্ন্যাস ও নিবৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন সমন্বয় সাধন করিয়া পূর্ণ মানব গঠন করিতে প্রয়াসী হইত। ইহারই ফলে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে এক রূপই না হইয়া এবং প্রত্যেক জীবদ্দশায় এক বিষয়ীভূত না হইয়া বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছিল; এবং চরমে মুক্তিলাভের সোপানপ্রতিষ্ঠাকল্পে তাহারা প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির বিকাশ-সাধনোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন স্তর বিভাগ করিয়াছিল। এই লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যেই তাহারা প্রথম হইতে তাহাদের

বিশিষ্ট ধর্ম্মভাব ও মুক্তিবাদের অবতারণা করিয়া ইহার দ্বারা শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবন সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টিত হইত। ইহার ফলে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির অভাব হইলেও প্রকৃত আধ্যাত্মিক ভাবের বিকাশ হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত। এইজন্য তাহারা শরীরকে ধর্ম্মের সাধন মাত্র মনে করিয়া ধর্ম্মজীবন-গঠনোপযোগী পুষ্টি ও উৎকর্ষসাধনের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

এইরূপ স্বাধীনতা ও আধ্যাত্মিকতাই তাহাদিগের ব্যক্তির শিক্ষা ও জীবনগঠনের ব্যবস্থাপক ছিল বলিয়া তাহাদের সাধারণ রাষ্ট্রের জটিলতা বৃদ্ধি করে নাই; রাষ্ট্র তাহাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের নিয়ন্তা বিবেচিত না হইয়া কেবলমাত্র লোকরক্ষার ও দেশরক্ষার উপায় মাত্র ভাবে লোকের মনে স্থান পাইত। এই জন্য তাহাদিগকে রাষ্ট্রে কর্ম্ম করিয়া, রাষ্ট্রসভায় বক্তৃতা করিয়া কালাতিপাত করিতে হয় নাই। শ্রমবিভাগের নিয়মে রাজহস্তে আভ্যন্তরিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও বহিঃশত্রু হইতে দেশরক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া তাহারা জীবনের চারি আশ্রমের কর্ত্তব্য পালন করিত, এবং ইহাতে রাষ্ট্রের উন্নতি অবনতি নিরপেক্ষ হইয়া তাহারা স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বিকাশের ব্যবস্থা করিয়া

রাষ্ট্র সভ্যতার কেন্দ্র নহে

ছিল। এজন্য রাজসভা এবং রাজধানীই তাহাদের সভ্যতার কেন্দ্র না থাকিয়া তাহাদের নিজ নিজ আবাসভূমি, লোকালয় ও পল্লীসমূহই জীবনী শক্তির আধার ছিল। ইহার ফলে রাষ্ট্র তাহাদের সর্ব্ববিধ জীবনকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় নাই—সর্ব্বব্যাপী হইতে পারে নাই।

ব্যবসায়পদ্ধতিতে সহানুভূতি ও সমবায় নীতির ফলে প্রত্যেক ব্যক্তির পরিপূর্ণতা

এইরূপ জন্মান্তর ও পরকালবাদে বদ্ধমূল ধর্ম্মভাবই তাহাদের ব্যবসায়পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া বৈষয়িক অবস্থার মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিল। ইহারই ফলে কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি বা সমাজবিশেষের ক্রীড়াপুত্তলিরূপে বিবেচিত না হইয়া নিজ চরম লক্ষ্যানুসারে বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইত। ইহারই ফলে তাহাদের সমাজ প্রত্যেকের পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করিবার সুবিধা সৃষ্টি করিয়া দিয়া প্রতিযোগিতা ও জীবনসংগ্রামের সর্ব্ববিধ বাধা দূরীভূত করিত। শিল্পে ও বাণিজ্যে তাহারা সমাজের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া রাষ্ট্রের বিশেষ কোন সাহায্য প্রাপ্ত না হইয়াও স্বাধীনরূপে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। তাহাদের সামাজিক জীবনগত ও পরিবারগত এবং গ্রামগত সভ্যতা শিল্প ও ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইয়া বৈষয়িক

ব্যাপারের মধ্যে পরস্পর সখ্য, সহানুভূতি ও সমবায়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল; এবং সাধারণতঃ ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য না থাকিয়া ত্যাগ-প্রবৃত্তি ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিচালিত হইত।

এই বৈচিত্র্যপ্রিয়তারই ফলে যেমন তাহারা ব্যক্তিগত জীবনে ও শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে স্থূলতঃ অসামঞ্জস্য এবং অসর্ব্বাঙ্গীনতারও প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, এই স্বাধীনতা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাহারা যেমন শরীর ও বিষয়-সম্পত্তিকে ধর্ম্মজীবনের এবং পরিপূর্ণ মানবত্ববিকাশের সাধনমাত্র মনে করিত, সেইরূপ স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, মুক্তি এবং চরম লক্ষ্য সাধনের আকাঙ্ক্ষাই তাহাদিগকে স্থাপত্যকার্য্যে, মন্দিরপ্রতিষ্ঠায় এবং মূর্ত্তিগঠনে তাহাদের শিল্প-নৈপুণ্য ও কারুকার্য্যের উৎপ্রেরণা ছিল। যে কোন উপায়ে, যে কোন প্রণালীতে তাহারা চিত্তের ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেই কৃতিত্ব স্বীকার করিত। স্থূল শরীরের উৎকর্ষেই মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি না করিয়া অন্তরঙ্গের উচ্চ ভাবব্যঞ্জক গড়ন দিতে পারিলেই শিল্পীরা কৃতার্থ মনে করিত। এ জন্যই তাহারা হৃষ্টপুষ্ট মাংসপেশীর সৌসাদৃশ্যবিশিষ্ট কুস্তিগির-

কলাবিদ্যায় অমৃত ও অনাদ্যন্ত ভাবসমূহের প্রকাশ

দিগের মূর্ত্তি স্থাপিত না করিয়া আধ্যাত্মিক ভাবব্যঞ্জক ধ্যানী যোগীদিগের মূর্ত্তি গঠন করিয়াই দেবত্ব ও মহাপ্রাণত্বের পরিচয় প্রদান করিত; এবং ইহারই জন্য অসীমকে সসীমের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখা অসম্ভব মনে করিয়া, সামান্য সামান্য স্থূল পদার্থসমূহের সাহায্যে বিরাট্ সত্তার চিত্র প্রদান করিতে যাওয়া বাতুলতা মনে করিয়া তাহারা আকৃতির সৌসাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল না। ইহজগতের বিবিধ মানবীয় অসম্পূর্ণতা, বৈসাদৃশ্য ও অসামঞ্জস্যের মধ্যে তাহারা অনাদ্যন্ত পরম সত্যের প্রভাব উপলব্ধি করিত বলিয়া বাহ্যতঃ ও স্থূলতঃ কদর্য্যতা এবং সৌষ্ঠবহীনতায়ও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইত। তাহারা অতীন্দ্রিয়তা ও ভাবুকতার দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরস্পর-বিরোধী বাস্তবের সম্পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লইত। প্রকৃত সনাতন বিশ্বসৌন্দর্য্য ও বিশ্বসত্যের মধ্যে তাহারা অস্থায়ী এবং সাময়িক ভাব ও কর্ম্মসমূহের স্থান হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া অসম্পূর্ণতায়ও সম্পূর্ণতা, অনৈক্যেও ঐক্য এবং বিচ্ছেদেও মিলন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল।

তাহাদের সাহিত্যেও এই বিচিত্র সভ্যতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ চিত্রিত রহিয়াছে। পরিবারগত এবং সমাজগত জীব-

নের আদর্শসমূহ প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে যেরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে, এরূপ আর কোন সাহিত্যে করে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যক্তিই যে সভ্যতার কেন্দ্র, এবং ব্যক্তি নিজেই একটী লক্ষ্য, অপর কোন লক্ষ্যের সাধন-মাত্র নয়—এই ভাব ভারতবর্ষের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, সাহিত্য, কলা, শিল্প, বাণিজ্য, সকল বিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও স্বাতন্ত্রোপলব্ধিই ব্যক্তির চরম লক্ষ্য এবং ইহাই যে তাহার মুক্তি—এই সত্যই ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্ম্মভাবের মূল।

সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আধ্যাত্মিকতার অভিব্যক্তি

আর, ব্যক্তি নিজের চরম লক্ষ্য সাধনের জন্য পরিবারকে, সমাজকে এবং রাষ্ট্রকে যে অবস্থায় যতটুকু অধিকার দান করিবে, সেই টুকুতেই তাহারা সন্তুষ্ট ছিল বলিয়া ভারত-বর্ষের রাষ্ট্রীয় বিপ্লবসমূহের মধ্যে তাহাদের শিক্ষাপদ্ধতি, চিন্তাপদ্ধতি এবং সাধারণ সভ্যতাপ্রবাহ নিজের পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া বহু বাধা বিপত্তি ভেদ করিয়াও স্বাতন্ত্র্যের সহিত নব নব যুগোপ-যোগী নব নব জীবনীশক্তির প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

রাষ্ট্রের অনায়ত্ত বলিয়া রাষ্ট্রীয়বিপর্য্যয়েও ভারতীয় সভ্যতার লোপ-সাধন হয় নাই

ইতিহাসে শিখজাতি

শিখ ইতিহাসের অভ্যন্তর হইতে সত্য উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হইলে ক্রমবিকশিত সমগ্র ভারতেতিহাস সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট করিতে হইবে। শিখজাতির সভ্যতা ও উৎকর্ষ ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই সহিত জীবন্তভাবে জড়িত।

মানবজাতির ইতিহাসে যত মতবাদ প্রতিষ্ঠা ও সমাজগঠনকার্য্য সাধিত হইয়াছে, সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে যে যে শক্তির কার্য্য হইয়া বিচিত্র ঘটনাপারম্পর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে, এবং সেই সমুদয়ের প্রভাবে যে সকল উত্থান ও অভ্যুদয়, পতন ও ধ্বংসের অভিনয় হইয়াছে, তাহাদের সকলের মধ্যে যিনি যেরূপভাবে সামঞ্জস্যবিধান ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করিবেন, তিনি সেইরূপ ভাবে কোন এক আন্দোলন বা প্রতিষ্ঠানের মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন, তিনি সেইরূপভাবেই ইতিহাসের কোন এক অধ্যায়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন।

জগতের ঘটনাবলী পরস্পরসাপেক্ষ

ইতিহাস-বিজ্ঞানের শিক্ষা এই যে, জগতের কোন

ঘটনা বা কার্য্যই সর্ব্বকালোপযোগী বা সর্ব্বদেশোচিত

আন্দোলন সমূহ সাময়িক ও প্রাদেশিক

নহে। বিশেষ কতকগুলি শক্তির প্রভাবে বিশেষ কোন এক বিপ্লবের সূচনা হয়; প্রবর্ত্তক, অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বিপ্লবের সহায়তাকারী উপায়সমূহ দেশ ও কালানুসারে স্বতন্ত্র। এই দৈশিক ও সাময়িক ঘটনাবলীর পারম্পর্য্যেই ঐতিহাসিক মানবের অনন্ত জীবন; এই ধারাবাহিক বিপ্লবসমূহই সভ্যতার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সনাতন বা সার্ব্বকালিক বা সার্ব্বজনীন বলিয়া কোন ভাব বা সত্যের প্রতিষ্ঠা ইতিহাসের মানব করে নাই।

তবে ইতিহাসে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহা একেবারে লুপ্ত হয় না, তাহার ব্যবহার হয়, দেশ কাল ও পাত্রানুসারে প্রয়োগ হয়। এই উপায়ে সাময়িক এবং প্রাদেশিক সত্যগুলিও একপ্রকার অবিনশ্বর জীবন প্রাপ্ত হইয়া কালে কালে দেশে দেশে কার্য্য করিতে থাকে।

সুতরাং সাময়িক কতকগুলি অভাব পূরণ করিবার জন্যই সকল মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। বাবা নানক

নানকের ধর্ম্মোপদেশ কালোপযোগী

তাঁহার সমসাময়িক হিন্দুমুসলমান-মিশ্রিত সমাজের এইরূপই একজন গুরু ছিলেন।

বিশেষ এক ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া উপদেশ বীজ বপন করিবার জন্য তাঁহার আবির্ভাব, এবং বিশেষ এক ক্ষেত্রে এই বীজসমূহ উপ্ত হইয়াছিল।

ক্রমশঃ সেই ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তন হওয়ায় নূতন ক্ষেত্র সৃষ্টি হইয়া নূতন সমাজ ও নূতন আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করিয়াছিল। ধর্ম্ম ও সমাজের মধ্যে তিনি যে নবভাবের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কেবলমাত্র তাহার দ্বারাই পরবর্ত্তী সমাজের অভাব পূরণ সম্ভবপর হইল না।

সমাজে বিচিত্র আন্দোলনের ও রূপান্তরগ্রহণের আবশ্যকতা

কোন এক সমাজ কেবলমাত্র দু-একটী শক্তির দ্বারা চালিত হইলে এইরূপ এক মহাপুরুষের আবির্ভাবেই সমাজ চিরকাল চলিতে পারে। কিন্তু জগতে বিভিন্ন শক্তি, বিবিধ সমাজসংশ্রব প্রত্যেক সমাজকে সর্ব্বদা বিচিত্র ও জটিল করিয়া তুলিতেছে।

শিখদিগের ধর্ম্মরাজ্যেও এইরূপে এক বিভিন্ন অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইল। নবযুগোপযোগী এক নূতন সংঘটনের প্রয়োজন হইল। জাতীয়শক্তি ইহার পূর্ব্বে ধর্ম্মপ্রচারে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। সেই ধর্ম্মজীবনের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই সমাজ এখন তাহার শক্তি বিভিন্ন এক কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়ো-

শিখদিগের ধর্ম্ম-সমাজের রাষ্ট্ররূপ-পরিগ্রহ

জিত করিল। এই নূতন প্রয়োজনসাধনোপযোগী আয়োজন হইল বিরাট্ শিখসাম্রাজ্য সংকল্পে।

কিন্তু হিন্দুসমাজের সংস্কারসাধন, বা হিন্দুমুসলমানের সামঞ্জস্যবিধান অথবা শিখধর্ম্মপ্রচার এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিচিত্র জীবনপ্রবাহই জগতের ইতিহাসের একমাত্র ঘটনা নহে। যে সময়ে এই দেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আন্দোলন চলিতেছে, সেই সময়ে সমগ্র পৃথিবী বসিয়া নাই। ইতিমধ্যে নানাস্থানে নানা ধর্ম্মের উত্থান, সংস্কার, অভ্যুদয় ও পতন হইল, নানা বিদ্যার বিকাশ, উৎকর্ষ ও বিপ্লব সাধিত হইল। শতাব্দব্যাপী সংগ্রামের পর সংগ্রাম ইউরোপায় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে কত বাধিল। নূতন আবিষ্কার, উপনিবেশস্থাপন, রাজ্যবিস্তার, বিজ্ঞানপ্রচার, ও শিল্পপ্রতিষ্ঠার কত বিভিন্ন অধ্যায় মানবেতিহাস প্রকটিত করিল। ভারতবর্ষে ইউরোপ আসিল।

বিশ্বমানবের কার্য্যাবলী ও শিখ রাষ্ট্র

এখন মারহাট্টা বা শিখ অভ্যুদয়ে ভারতবর্ষের সমগ্র আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার নহে। প্রধান আকাঙ্ক্ষা শান্তি, প্রধান অভাব রাজনৈতিক ঐক্য। সুতরাং শান্তিপ্রতিষ্ঠাতা, অপেক্ষাকৃত প্রবল

ভারতীয় শান্তিপ্রতিষ্ঠায় শিখের অক্ষমতা

পরাক্রান্ত, সামঞ্জস্যবিধানক্ষম শক্তি ভারতে নবযুগের নূতনজীবন প্রবর্ত্তনের সহায় হইল।

এখন কথা এই যে, এই সমুদয় বিচিত্র উত্থান-পতনের মধ্যে শোকাবহ কি?—উত্থান, না পতন? এবং আনন্দের বিষয়ই বা কি? জাতীয়জীবনের সার্থকতা বা পরিসমাপ্তি কোথায়? এবং কোন্ জাতি প্রকৃত সার্থকতালাভ করিয়াছে?

ঐতিহাসিকের সমস্যা

শিখেরা প্রথম যুগে ভারতবর্ষকে যাহা দান করিয়াছিল, পরবর্ত্তীযুগে তাহা দান করে নাই, অথবা তাহাদের আদি গুরুর জীবন নিষ্ফল হইয়া গেল—ঐতিহাসিকগণ এরূপ ভাবিতে পারেন না। বুদ্ধদেবের উপদেশের ন্যায় এক বিচিত্র অমরতা লাভ করিয়া বাবা নানকের দীক্ষা তাঁহার পরবর্ত্তী কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত নানাভাবে নানা ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া বিচিত্র উপায়ে ভারতবর্ষে কার্য্য করিয়া আসিতেছে। তৎকালাবধি স্বাধীনচিন্তার বিকাশ, পবিত্রজীবনের আকাঙ্ক্ষা, প্রকৃত ভগবদ্ভক্তি ও মানবসেবার প্রবৃত্তি ভারতবর্ষের সাহিত্যে, সমাজে, চিন্তাপ্রণালীতে, পিতাপুত্রের সম্বন্ধে, সাধারণ কার্য্যকলাপে, এবং ধর্ম্মপ্রচারে—কেবলমাত্র পঞ্জাবের জাঠসম্প্রদায়ের মধ্যে নহে, সমগ্র দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই

জাতীয় জীবনের সার্থকতা কাহাকে বলে?

প্রবিষ্ট হইয়া যুগে যুগে বিপ্লবের পর বিপ্লবের অবতারণা করিয়া আসিয়াছে।

এখন কিন্তু শিখদিগের ঠিক সেই আদিম বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি, তাৎকালিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নাই বটে। সেই যুগের এবং সেই প্রদেশের সঙ্কীর্ণতা, প্রাদেশিকতা ও সাময়িকতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আদিগ্রন্থের শিক্ষা মারহাট্টী, হিন্দী এবং বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া কত পল্লীর কত নগণ্য লোককে প্রকৃত "শিখ্" করিয়া তুলিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? শিখসম্প্রদায় হঠাৎ মরুভূমিতে আসিয়া শুকাইয়া যায় নাই। বাবা নানকের জীবন সার্থক হইয়াছে, এবং তাঁহার শিক্ষা অক্ষয় থাকিবে।

আধুনিক ভারত

বিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহা প্রধানতঃ বৈষয়িক ও রাজনৈতিক। আমাদের আধুনিক বীরগণ রাষ্ট্রনীতির প্রচারক এবং রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্মী।

ভারতবর্ষে এক সময়ে সামাজিক আন্দোলনের প্রাধান্য ছিল। যখন পরাধীনতা স্পর্শ করে নাই, তখন অন্যান্য স্বাধীন জাতির ন্যায় শিক্ষা দীক্ষা, সামাজিক কর্ম্মের প্রথা প্রভৃতি স্বাভাবিকভাবে সংস্কার করিবার নিমিত্ত আন্দোলন চলিত। জাতিভেদ, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ, ধর্ম্মশিক্ষা, অধিকারিনির্ণয় ইত্যাদি সামাজিক এবং ধর্ম্মজীবনের উন্নতিকল্পেই সমস্ত কার্য্য ও চিন্তা হইত। হিন্দুজাতি রাজনৈতিক বিষয়ে রাজা এবং তাঁহার কর্ম্মচারিগণকে সম্পূর্ণ অধিকারী করিয়া দিয়া, সমাজের, পরিবারের ও গ্রাম্যজীবনেরই শৃঙ্খলা বিধান ও মঙ্গলকামনায় শক্তির প্রয়োগ করিতেন,—রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের তত বেশী ধার ধারিতেন না।

প্রাচীন ভারত

তার পর মধ্যযুগে যে সমস্ত আন্দোলন হইত, তাহা

দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য বটে, কিন্তু ধর্ম্ম-রক্ষাই প্রধান উপলক্ষ্য থাকিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও প্রবৃত্তিই তখনকার ধর্ম্ম এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের মূলে ছিল। রাজপুত, মারহাট্টা, শিখ প্রভৃতি জাতির অভ্যুত্থান হিন্দুধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য। মুসলমান-সাম্রাজ্যের ধ্বংস এবং লয়ই সেই সময়ের চিন্তা ও কর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই জাতিগত ও ধর্ম্মগত বিরোধের উত্তেজনায়, হিন্দু মুসলমানের ঐতিহাসিক পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া তখনকার দেশ-হিতৈষীরা স্বদেশ-সেবায় ব্রতী হইতেন। রাজার সঙ্গে প্রজার কিরূপ সম্বন্ধ হওয়া উচিত অথবা খাজনা দেওয়ার নিয়মপদ্ধতি পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রজাতন্ত্রশাসনের রীতিমত ব্যবস্থা করা উচিত, তাহা তখনও লোকের মনে উদিত হয় নাই। সেই হিন্দুর আধিপত্যকালে রাজতন্ত্র-শাসনের মধ্যেই যেরূপ প্রজা-তন্ত্রের বীজ ছিল, প্রজার অধিকার যে পরিমাণে ছিল, প্রায় তদ্রূপই রক্ষা করিয়া, মুসলমানকে দেশ হইতে বিতাড়িত করাই তখন স্বদেশ-প্রেমের লক্ষ্য ছিল।

মুসলমান প্রভাবের যুগ

তাই ধর্ম্ম ও রাজনীতি উভয়ই মিলিত হইয়া যুগান্তর সৃষ্টির সহায়তা করিত। আমাদের দেশের মধ্যযুগের আন্দোলন

ধর্ম্মের জন্য এবং স্বাধীনতার জন্য। দুইই প্রায় সমানভাবে বর্ত্তমান। তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজসংস্কার, পারিবারিক জীবনের এবং অন্যান্য সকল প্রকার উন্নতির চেষ্টাও হইয়াছিল। প্রতাপসিংহ, গোবিন্দসিংহ, নানক, শিবাজী, রামদাস, কবীর, চৈতন্য, প্রতাপাদিত্য ইত্যাদি কর্ম্ম ও চিন্তা বীরগণ প্রত্যেকেই ধর্ম্মের উন্নতি সাধনের জন্য বিদেশীয় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন, অথবা সমাজে মুসলমানের প্রাধান্যে যে কুসংস্কার ও বিপ্লব ঘটিতেছিল, তাহার বিনাশের জন্য কর্ম্ম করিতন। একদিকে বিধর্ম্মীর হস্ত হইতে দেশ ও ধর্ম্ম উদ্ধার করা, অপরদিকে হিন্দুর স্বাভাবিক ভক্তি ও প্রেমের রাজ্য নূতন অবস্থার অনুযায়ি রূপে বিস্তার করা—এই দুই লক্ষ্য ভারতীয় মধ্যযুগে হিন্দুর মন অধিকার করিয়াছিল।

ইংরাজ-আগমনের পর নূতন ছাঁচে ঢালা ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষণে দেশের এবং সমাজের অবস্থার অনেক

বর্ত্তমান ভারতে দেশহিতৈষণার লক্ষ্য

পরিবর্ত্তন হওয়ায় দেশহিতের চেষ্টা আর এক রকমের হইল। এখন কি উপায়ে বিদেশীয় বিজ্ঞান ও শাসনপ্রণালী, জড়-জগতের উপর আধিপত্য-স্থাপন এবং রাষ্ট্রে জাতি ও ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক প্রজার অধিকারপ্রতিষ্ঠা, আমাদের এতদিনকার

সভ্যতার অঙ্গীভূত হইতে পারে, কি উপায়ে সমাজ আধুনিক ভাবসমষ্টির মধ্যে জীবন্তভাবে বিকাশ লাভ করিয়া পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীয় নূতন এক সভ্যতা সৃষ্টির সহায় হইতে পারে, এবং বিশ্বের সভ্যতা-ভাণ্ডারের কলেবর বৃদ্ধি করিতে পারে—এই দেড়শ বৎসরের স্বদেশপ্রেমিকগণ এই ইচ্ছাই পোষণ করিয়া আসিয়াছেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনই প্রধান লক্ষ্য রহিয়াছে, ধর্ম্মের বৈষম্যে, অথবা ভাষার বিভিন্নতায় দ্বন্দ্বকলহ আর বেশী ভীতিজনক বোধ হয় না। সেই জন্যই ধর্ম্মের আন্দোলন বা সামাজিক উন্নতির চেষ্টা এখন তত বলবতী নহে। বৈষয়িক ব্যাপারে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রত্যেক লোককে স্বাধীনতা, অর্থাৎ নিজ নিজ-শক্তি-অনুসারে পৃথিবীতে কর্ম্ম করিবার অধিকার, প্রদান না করিলে কি সামাজিক, কি ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, প্রত্যেক বিষয়েই খর্ব্বতা, হীনতা এবং কুসংস্কার উপস্থিত হয়। অতএব দেশের মধ্যে প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য স্বাধীনচিন্তা ও স্বাধীন কর্ম্মের ক্ষেত্র আবশ্যক—এই ভাবই স্বদেশপ্রেমিক-দের চিত্তে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। আমাদের দেশে

বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলন

আজকাল সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্ম্মবীরেরই সংখ্যা অধিক।

এখন ধর্ম্মের আন্দোলন এবং সমাজসংস্কারের চেষ্টা যে একেবারে দেখা যায় না, তাহা নহে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দ অন্ততঃ তাহার প্রমাণ। তবে আমাদের দেশের চিন্তা ও কর্ম্ম যে দিকে ধাবিত হইতেছে, তাহার প্রধান লক্ষ্য প্রজাশক্তির উত্তোলন এবং দেশে বিজ্ঞানচর্চ্চার বিস্তৃতি। এই বৈষয়িক আন্দোলনের ভিতর দিয়াই আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ পরিষ্কার হইয়া আসিবে—এই ধারণাই জাতীয় চিত্তে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

আধুনিক কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

আধুনিক ভারতের এক লক্ষণ কর্ম্মিগণের বৈষয়িক জগৎ ও রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে অধিকার-স্থাপনের চেষ্টা। আর এক লক্ষণ এই যে, বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালীজাতির কাজ করিবার সময় এখন আসিয়াছে। ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে রাজপুত, শিখ, ও মারহাট্টার কৃতিত্ব অনেকবার প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর ক্রিয়াশক্তি ও চরিত্রবল, বাঙ্গালীর ঐক্য এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এখনও বিশেষভাবে পাওয়া যায় নাই। যে বৈজ্ঞানিক

বুদ্ধির অভাবে মধ্যযুগে একীকরণ ও সমন্বয়-সাধনের সুবিধা না থাকায় মুসলমানসাম্রাজ্য লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল, হিন্দুদের রাজ্যপ্রাপ্তির চেষ্টা ক্ষণিক আশা-সঞ্চারের মত অলক্ষেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; যে রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ, খবরের কাগজ, এবং যাতা-য়াতের সুবিধার অভাবে জনসাধারণ রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ এবং অনুপযুক্ত হওয়ায়, সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা ও স্থিরতা অসম্ভব হইয়াছিল, পাশ্চাত্যজগতের বিশিষ্ট আবিষ্কার সেই পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্যে ভারতে যে নূতন জীবনপ্রথা, নূতন কৃতিত্বের ইতিহাস রচিত হইতে চলিয়াছে তাহাতে বাঙ্গালীই অগ্রণী এবং পথপ্রদর্শক।

নবযুগের কারণ—পাশ্চাত্য সংঘর্ষ

এই নূতন ভাব যে বাঙ্গালায়ই প্রথম উদিত হইয়াছে, এবং এই নবশক্তি যে বাঙ্গালী জাতির মধ্যেই প্রথম অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার যথেষ্ট কারণও আছে। ভারতে এই নবজীবন আগমনের, নূতন আদর্শ-স্থাপনের প্রধান কারণ,—ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। ইউরোপীয় বিদ্যা, সাহিত্য, সভ্যতা, চিন্তা এবং কর্ম্মই ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শের সঙ্গে মিলিত হইয়া

নূতন এক সভ্যতার সৃষ্টি করিতে চলিয়াছে। এজন্য পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা ভারতের যে সমাজে এবং যে প্রদেশে বেশী প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই দেশ ও সেই সমাজই নব্যভারত গঠনের নেতা, সেই প্রদেশের চিন্তা ও কর্ম্ম-বীরই অপরের পথপ্রদর্শক এবং আদর্শ স্থানীয়।

বঙ্গে বিদেশীয় সংমোহন

বাঙ্গালা দেশ অনেকদিন হইতে এই পাশ্চাত্যজাতির সংশ্রবে রহিয়াছে। বিদেশীয় শিক্ষা ও চালচলন ভারতের অন্যান্য সমাজ অপেক্ষা এখানেই অধিক অধিকার লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালী সমাজের অতি নিভৃত স্থানে এবং ধর্ম্মজীবনে পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের আধিপত্য বেশী। দুই ভিন্ন পথাবলম্বী সমাজের সংঘর্ষণে প্রথম প্রথম যে যে বিপ্লব ও আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী, সেই সমুদয় বিপ্লব বাঙ্গালী সমাজকে বিশেষরূপে তরঙ্গায়িত করিয়াছে। বিলাস-প্রিয়তা, সকল বিষয়ে বিদেশীর অনুকরণ, ইংরাজী সভ্যতাপরায়ণতা, চাকুরীর প্রবৃত্তি, স্থূল চাক্‌চিক্যে মনোনিবেশ, এবং পাশ্চাত্যজীবন ও চরিত্রের বাহ্য বিষয়গুলির প্রতি আসক্তি প্রভৃতি সম্মিলন-জনিত স্বাভাবিক দোষসমূহ অতি প্রবল ভাবেই বাঙ্গালীর চরিত্র আক্রমণ করিয়াছে।

সকল বিষয়ে 'স্বদেশী'র প্রতিষ্ঠা

আবার এই অবস্থার পুনরায় যে প্রতিক্রিয়া অবশ্য-ম্ভাবী, বঙ্গদেশেই স্বদেশীআন্দোলনের ভিতর দিয়া প্রথমে তাহারও সূচনা দেখা গিয়াছে। বিদেশীয় সভ্যতার সঙ্গে অত্যধিক পরিচিত থাকায়, ইহার প্রকৃত জোরের স্থান কোথায়, ইহার কি সত্য আছে এবং কতটুকু এই দেশ ও সমাজের উপযোগী বলিয়া গ্রহণীয়, সেই বিষয়ে ধারণা এখানেই পরিস্ফুট হইয়াছে। এজন্য কিছুকাল ভোগবিলাস ও চিত্ত-সম্মোহনের পর, পাশ্চাত্য সভ্যতার যাহা যাহা আমাদের পক্ষে উপাদেয়, সেই সমুদয় নিজের মত করিয়া স্বাধীন-ভাবে গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি বাঙ্গালীর চরিত্রেই প্রথম দেখা যাইতেছে। ধর্ম্মগত সামাজিক জীবনকে নূতন অবস্থার উপযোগী করিয়া বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য জাতির ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য-রক্ষার চেষ্টা এবং বিজ্ঞানালোচনার সঙ্গে ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার ইচ্ছা বাঙ্গালীর মধ্যেই বেশী।

আর, প্রকৃত প্রস্তাবে বিদেশীয় সভ্যতা এবং শিক্ষার সুফল বাঙ্গলাদেশেই ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। নব-জীবনের উপলব্ধি, বৈষয়িক উন্নতি এবং স্বাধীনচিন্তা ও কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা বাঙ্গালায়ই প্রবল। এই সকল ফলের

প্রধান লক্ষণ—নূতন জাতীয় জীবনের অনুকূল বাঙ্গালা-ভাষা এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টি। জাতীয়তা, জড়-বিজ্ঞান প্রভৃতি নূতন নূতন প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের মূলমন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। এখন সকল প্রকার চিন্তা, সকল প্রকার রচনা বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর ভাষায় অত্যুচ্চ দর্শন ও বিজ্ঞানের জটিল ভাবগুলিও সুন্দর ও স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করা যায়। কাব্য, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি সকল বিষয়েই বাঙ্গালা-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন হইয়াছে।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্য এখনও অতি হীন অবস্থায় রহিয়াছে। হিন্দীর এখন পর্য্যন্ত ভাষারই স্থিরতা নাই। একটী সাহিত্যিক ভাষার উৎপত্তি এখনও হইতে পারে নাই। তামিল ও তেলুগু ভাষায় অতি সামান্য সাহিত্যই রচিত হইয়াছে। মারহাটী ভাষায় দুই চারিজন গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায় মাত্র। প্রেমসঙ্গীত এবং ধর্ম্মসাহিত্য ছাড়া অন্য প্রকারের চিন্তা মারহাটী ভাষায় বেশী বহির্গত হয় নাই।

ফলতঃ, সকল দিক্ হইতে বাঙ্গালা দেশেই ইউরোপীয়

সভ্যতার কাজ বেশী হইয়াছে। এই জন্য বাঙ্গালীই বিংশ শতাব্দীতে ভারতের পথপ্রদর্শক, ইউরোপীয় বিদ্যাসমুহ ভারতের উপযোগী করিয়া প্রচলিত করিবার পক্ষে নেতা। এইজন্য বাঙ্গালী কর্ম্মীই এখন ভারতে অধিক।

একদিকে যেমন আধুনিক ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনই প্রধান, তেমনি এই ভারতীয় আন্দোলনের মধ্যে বাঙ্গালীই অগ্রণী, বাঙ্গালী বীরেরই প্রধান্য—বাঙ্গালীই স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সমগ্র ভারতকে স্বার্থত্যাগী করিয়া তুলিতেছে।

বাঙ্গালী বীরদের মধ্যে আবার অনেক শ্রেণী রহিয়াছে। বীরেরা সকলেই একই অসত্য, একই অবিদ্যানাশের জন্য আবির্ভূত হন না। সময় ও দেশভেদে এক এক প্রকার সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মী আবির্ভূত হন। তেমনি একই সত্যপ্রতিষ্ঠার মধ্যেও আবার স্তর আছে, প্রণালী আছে—অনেককে এক কাজ করিতে হইলেও সকলের একই উপায় এবং একই প্রথা অবলম্বন করিতে হয় না। কেহ বা চিন্তায় প্রধান, কেহ বা কর্ম্মে প্রধান; কেহ বা নূতন ধর্ম্মের স্রষ্টা, কেহ বা ভাবগুলিকে আকার প্রদান করিয়া গড়িয়া তুলিবার কর্ত্তা।

প্রবর্ত্তকগণের বিভিন্নতা

চিন্তা-বিষয়ক ধুরন্ধরের অভাব

আমাদের এখন এরূপ নায়কের প্রয়োজন, যিনি এই রাষ্ট্রীয় চিন্তারাজ্যে শৃঙ্খলা আনয়নের সেনাপতি হইতে পারেন। বাঙ্গালাদেশে বিদেশী-সভ্যতা যে শক্তির উদ্রেক করিয়াছে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে যে বাসনা মনে উদিত হইয়াছে, আধুনিক জগতের উপযুক্ত করিবার জন্য তিনি সেই সমুদয় শক্তি এবং বাসনা সংযত ও সুসজ্জিত করিয়া একই উদ্দেশ্যে সংগঠন করিবেন, এবং বিভিন্ন প্রকার চিন্তার মধ্যে পরস্পর বিরোধিভাব ঘুচাইয়া দিয়া একীকরণের প্রভাবে একটি দানা বাঁধাইয়া দিবেন। এরূপে চিন্তায় দৃঢ়তা, স্থিরতা এবং ব্যাপকতা আসিবে। আমাদের রাজনৈতিক বিষয়ে চিন্তার সমন্বয় ও শৃঙ্খলা জন্মিবে। ভাবের অসম্বদ্ধতা ও বিচ্ছিন্নতা আর যেন না থাকে।

এতদিনকার নানা প্রকার আন্দোলনের ফলে যে নব-শক্তির সঞ্চার হইয়াছে, তাহাকে সমাজের প্রত্যেক বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া, দেশের সমগ্র ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তার সম্পূর্ণতা প্রদান এবং জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য স্থির করা কর্ত্তব্য হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই লোকের চিত্তে যে যে আশা ও ইচ্ছা স্থান পাইয়াছিল, সেই নব আশা এবং

ইচ্ছাকে এইরূপে পরস্পরের সঙ্গে মিলাইয়া শৃঙ্খলীকৃত করিতে পারিলে যে বিশদ ভাবসমষ্টি গঠিত হইবে, তাহা নূতন জাতীয় জীবনের প্রাণস্বরূপ হইয়া থাকিবে।

নূতন ভাব প্রদান না করিলেও বিদ্যমান ভাবও শক্তিপুঞ্জের যথাযথ ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে যে আয়তন, আকার ও রূপ প্রদান করা যাইবে, তাহাই ধুরন্ধরের প্রতিভার পরিচায়ক হইবে।

দেশের উন্নতিসম্বন্ধে জাতীয়চিন্তার ক্রমিক বিকাশ

ভারতে ইংরাজ-আগমনের পর অনেক নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। ইংরাজের বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়া, ইউরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়া, বিদেশীয় সমাজের সহিত আলাপ পরিচয় ও সম্মিলনের ফলে, এবং নূতন বিজ্ঞান ও নূতন নীতিশাস্ত্রপাঠ করিয়া, আমাদের দেশের লোকেরা এক অভিনব ভাবে সমাজ ও ধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং এক নূতন চোখে পৃথিবীর হাবভাব, জগতের সমস্ত ব্যাপার দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের সম্পর্কে থাকিয়া; বিদেশী বণিক্‌দের সঙ্গে ব্যবহারে আসিয়া আমাদের লোকের হৃদয় অর্থনীতি এবং রাজনীতির উপদেশ বিশেষভাবে লাভ

করিয়াছে। এইরূপ নূতন বেষ্টনীর প্রভাবে আমাদের চিন্তা ও কর্ম্ম-প্রণালীর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নানা বিষয়ে আমাদের উদ্যম ও পরিশ্রম চালিত হইয়াছে।

এইরূপে সাহিত্য, ভাষা, ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, ধনাগম ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়েই নূতন অবস্থানুরূপ ব্যবস্থার আরম্ভ হইয়াছে। স্বাধীনচিন্তা এবং স্বাবলম্বন প্রবৃত্তির ফলে প্রায় সকল বিষয়েই অশেষ প্রকার তর্ক-প্রশ্ন উঠিয়াছে। দেশের দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অকালমৃত্যু, অত্যাচার, অবিচার, চিত্তসংমোহন, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস, ধর্ম্মে অনাস্থা ইত্যাদি সমাজের অনৈসর্গিক ব্যাধির প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এই সকল অসত্য দূর করিবার জন্য দেশে যতপ্রকার চিন্তা ও কর্ম্ম-ক্ষেত্র সৃষ্ট হইয়াছে, যত অনুষ্ঠান, দলগঠন, সভাসমিতি, ফণ্ড, কংগ্রেস ও বক্তৃতা হইয়াছে, অন্ধকার নাশ করিবার জন্য আমাদের দেশ-হিতৈষীরা যত রকমের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃত সত্য, প্রকৃত বিদ্যা, প্রকৃত ধর্ম্ম, প্রকৃত রাজনীতি-স্থাপনের পথে আমাদের সমাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

কিন্তু এই সকল কর্ম্ম ও চিন্তা এতদিন বিক্ষিপ্ত ভাবে হইতেছিল, পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ ও আদান-প্রদানে

উৎসাহিত এবং বর্দ্ধিত হইবার তত সুবিধা ছিল না। সকল প্রকার ভাবনা একত্র সন্নিবেশিত করিয়া দেখা হয় নাই। কেহই এতদিন পর্য্যন্ত এই চিন্তা ও কর্ম্মরাশিকে ব্যাপকভাবে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে প্রয়াসী হন নাই। ইহাদের শ্রেণীবিভাগ এবং একের সঙ্গে অপরের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে কেহই অগ্রসর হন নাই।

চিন্তা-ধুরন্ধরের কর্ত্তব্য—জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য-সংগঠন

এই সমস্ত সত্য আবিষ্কারের পথ পরিষ্কারভাবে সমাজের সম্মুখে ধরিয়া দিতে হইবে, এবং দেশের যাবতীয় মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের ব্যক্তিগত চিন্তাগুলিকে এক স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া একটী প্রকাণ্ড চিন্তা-কলেবরের পুষ্টিসাধন করিতে হইবে। দেশের মহান্ অতীতকে না ভুলিয়া গিয়া এবং বর্ত্তমান কালের ভাবসমষ্টির সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া ভবিষ্যতে কোন্ পথে চলিতে হইবে, এজন্য রাজাপ্রজার কিরূপ অধিকার বিভাগ ও কর্ত্তব্য বিভাগ করা উচিৎ,এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মের কিরূপ রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী এবং কোন্ আন্দোলনের সঙ্গে কোন্ আন্দোলন করা যুক্তিসঙ্গত—এক কথায়, প্রত্যেক চিন্তা ও কার্য্যের পরস্পর সম্বন্ধ এবং উপকারিতা সম্বন্ধে লোকের অস্ফুট এবং উড়ু উড়ু

ধারণাগুলিকে একই কেন্দ্রে চালনা করিয়া এক চিন্তা-সঙ্ঘ সৃষ্টি করিতে হইবে।

এই বিংশ শতাব্দী আমাদের দেশের লোকের হৃদয়ে যে শক্তির সঞ্চার করিয়া দিয়াছে, এতদিন আমরা নীরবে বা অস্পষ্ট ভাবে যে আশার কথা ভাবিতেছিলাম ও বলিতেছিলাম, ইনি সেই সমস্ত আধ আধ কথা অখণ্ড বিশ্বাসের সহিত ঘোষণা করিয়া নীরবতা ও ভীতির ভাব দূর করিবেন। লোকের মনে অন্ধকার আর যেন না থাকে। যেন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গোলমেলে অস্পষ্ট ভাব দূর হইতে পারে।

চিন্তার শৃঙ্খলাবিধান

এখন আমাদের এরূপ নেতার প্রয়োজন যিনি এত দিনের পর জনসাধারণের মনে উদিত নব্য-ভারত-প্রতিষ্ঠার আশাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ভাবের রাজ্য সংগঠিত করিতে পারেন। এই ভাবুকতা ও চিন্তা-তন্ত্রই সমাজকে কর্ম্মে প্রণোদিত করিয়া তাহার বহুদিনের আশা এবং অভিলাষকে পূর্ণ করিবে।

বীরত্ব

নূতন আলোক ও নূতন ভাব দান করাই প্রতিভার একমাত্র লক্ষণ নয়। অনেক সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মী এবং ভাবুকেরা যে উপকরণ ও যে উপাদান রাখিয়া গিয়াছেন, সেগুলিকে নিজের মত করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলেও শক্তির পরিচয় দেওয়া যায়। লোক-সমাজে অজ্ঞাত কোন সত্যের আবিষ্কার করার ন্যায় যে সমস্ত বিষয় বিশেষ পরিচিত তাহাদিগকে নূতন অবস্থার উপযোগী নূতন রূপ প্রদান এবং নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করাও স্বাধীন চিন্তার এবং মৌলিকতার প্রমাণ। পৃথিবীতে যাহা একেবারে জানা ছিল না, এপ্রকার তথ্যের উদ্ধার অতি অল্প ব্যক্তিই করিয়াছেন। অধিকাংশ স্থানেই পরিচিত সত্য-নিচয়ের সম্যক্ ব্যবহার এবং প্রয়োগ করিয়াই পণ্ডিতেরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন।

মৌলিকতার পরিচয়

ইউরোপের যত বীর পুরুষদের কথা আমরা জানি, যত কর্ম্মবীর ও চিন্তা-বীরের সন্ধান আমরা পাই, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পূর্ব্বগামী ব্যক্তিগণের কর্ম্মকেই সুসজ্জিত

করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের প্রথম এডো-

কয়েকটি নরপতির কৃতিত্ব

য়ার্ড, স্পেনের রাজ-দম্পতী ফার্ডিনাণ্ড এবং ইসাবিলা, ফ্রান্সের চতুর্দ্দশ লুই প্রভৃতি নরপতিগণ রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে যে শক্তি ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহাদের পূর্ব্বকালিক মন্ত্রী বা রাজা ও প্রজাগণের আরব্ধ এবং অর্দ্ধসফলতাপ্রাপ্ত কার্য্য ও চিন্তার ফল। তাঁহাদের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর অসম্বদ্ধ চেষ্টা হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের বিশেষত্ব এবং কৃতিত্বের প্রমাণ এই যে, তাঁহারা সেই শক্তিগুলিকে যথোচিত নিয়োজিত করিয়া পৃথিবীতে অভিনব চিন্তা ও কর্ম্মক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

কবি সেক্সপীয়র সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে অতুলনীয় যশঃ-প্রাপ্ত হইয়াছেন, যে অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়া

কবি সেক্সপীয়রের প্রতিভা

সকলকে বিমোহিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্বগামী কবি এবং সাহিত্য-সেবীদের প্রদর্শিত পথে তিনি চলিতে পারিয়া ছিলেন বলিয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বে অনেক গণ্য-মান্য উৎকৃষ্ট লেখকের আবির্ভাব হয়। নাট্য-কাব্যের সমস্ত উপকরণই ইনি উত্তরাধিকারীর ন্যায় প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। নাটক-রচনার প্রণালী, নাটকের চরিত্র-সমাবেশ, নাটকের উদ্দেশ্য, কর্ম্মের এবং কথোপকথনের মধ্য দিয়া চরিত্র-বিকাশ, ব্যঙ্গরস, ইত্যাদি কোন বিষয়ই তাঁহাকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে হয় নাই। নাট্যের মধ্যে ইতিহাস, রাজনীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব, পরিবার এবং সমাজ-চিত্র কোন্ কৌশলে কি উপায়ে প্রকাশ করিতে হয়, নাটকের চরিত্রসমূহের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির মুখে কিরূপ কথার শোভা পায় এবং এজন্য ভাষার কিরূপ বৈচিত্র্য আবশ্যক, নাটকের এই সমস্ত রীতিনীতি, লিখন ও অভিনয়-পদ্ধতি তাঁহার সম-সাময়িক সমাজে সাহিত্যিকগণের সাধারণ সম্পত্তি ভাবে বর্ত্তমান ছিল। এই সকল বিষয়ে তাঁহার মৌলিকতা প্রায় ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তবুও সেক্সপীয়র ইউরোপীয় কবিগণের অগ্রণী। ইহার কারণ, ইনি যে সকল জিনিষ পাইয়াছিলেন, সেই গুলিকে নিজের মত করিয়া এরূপ স্বাধীন ভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহাদিগকে এরূপ ভাবে সাজাইয়াছিলেন, অনুপাত এবং উপযোগিতায় তাঁহার এরূপ জ্ঞান ছিল যে, তাঁহার লেখনী-প্রসূত রচনাগুলি জগতের সাহিত্যভাণ্ডারের আশ্চর্য্য পদার্থ এবং সর্ব্বোচ্চ প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনস্বরূপ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ডালহাউসি ভারতে প্রতিষ্ঠিত নূতন রাজশক্তিকে দৃঢ় ও চিরস্থায়ী করিবার জন্য যে কাজ করিয়া ছিলেন, তাহা রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রের পূর্ব্ব-সঞ্চারিত শক্তি-সমষ্টির সুব্যবহার মাত্র। আবার ওয়াসিংটন আমেরিকার যুক্তপ্রদেশপ্রতিষ্ঠাতা বটে, কিন্তু ঐক্য এবং সমন্বয়-সাধনের উপায় উদ্ভাবন অনেক আমেরিকাবাসীই তাঁহার পূর্ব্বে করিয়াছিলেন।

ডালহাউসি ও ওয়াসিংটন

এইরূপে নূতন কিছু প্রদান না করিয়াও, বিশেষ ভাবে সাজাইতে গুছাইতে জানিলেই অভিনব মৌলিকতার এবং শক্তির পরিচয় দেওয়া যায়। যে ভাব ও শক্তি-সমষ্টির মধ্যে মানুষ নিক্ষিপ্ত, তাহাকে ব্যবহার করিতে যে জীবনীশক্তির আবশ্যক, তাহা অল্প মহত্ত্বের এবং স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় নয়।

জগৎকে ব্যবহার করিবার শক্তি

কিন্তু ওয়ারেণ হেষ্টিংসের চরিত্র নূতন বিচার-প্রণালী সৃষ্টি-কৌশলে প্রতিভাত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে ভারতে হিন্দু ও মুসলমানগণের বিচার-পদ্ধতিতে যে সমুদয় অসম্পূর্ণতা ছিল, তিনি সেই সকলগুলি সংশোধন করিয়া নূতন এক প্রথার আবিষ্কার করিতে যে বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে অতুলনীয়। তাঁহার কর্ম্ম এত

হেষ্টিংসের বীরত্ব

দিনের মধ্যেও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। অনেক উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার আমূল পরিবর্ত্তন হইল না।

ম্যাট্‌সিনি ইউরোপে এক নূতন ভাব প্রদান করিয়াছিলেন; নূতন রকম জাতীয়তার সংবাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন। অসংখ্য ভাষা ও ধর্ম্মভেদ সত্ত্বেও যে রাষ্ট্রীয় ঐক্য হইতে পারে এবং স্বজাতির উন্নতিসাধনে বিশ্বমানবেরই উন্নতি হয়, একথা তিনিই ইউরোপের কাণে প্রথম প্রবেশ করাইয়াছিলেন। তিনি একদিকে যেমন ভাবজগতের পারদর্শী, অপর দিকে কর্ম্ম-জগতেও বীরপুরুষ, একদিকে নূতন মন্ত্রের আবিষ্কারকর্ত্তা, অপর দিকে মন্ত্রশক্তিবলে আহূত লোকসমাজকে দলবদ্ধ ভাবে রণক্ষেত্রে সম্মিলিত করাইবার অধ্যক্ষ। কর্ম্মজগতে এবং ভাবজগতে অধিকার তাঁহার ন্যায় অতি অল্প লোকেরই হইয়াছে।

ম্যাট্‌সিনির প্রতিভা

আমাদের বাঙ্গালা দেশের চিন্তা-জগতে বঙ্কিমচন্দ্র নূতন পথের প্রদর্শক। ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের বলে আমাদের দেশীয় সমাজ বিকশিত হইয়া যে রূপান্তর গ্রহণ আরম্ভ করিয়াছে বঙ্কিমবাবু ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে সেই নব্য ভারতের গঠনমন্ত্র "বন্দে

জাতীয় আদর্শসৃষ্টি-ব্যাপারে, বঙ্কিমচন্দ্র ও রামমোহনের মৌলিকতা

মাতরম্” মানসচক্ষে দেখিতে পাইয়া যখন তাঁহার উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেন, তখন তাঁহাকে কেহ বুঝে নাই। আমাদের দেশহিতৈষণা পূর্ব্বকালে বিশেষ এক ভাবে চলিয়া আসিতেছিল। দেশহিতৈষণা এখনকার নূতন অবস্থানুসারে রাষ্ট্রীয় ঐক্যবিধান রূপ যে নূতন আকার ধারণ করিতে চলিয়াছে, তাহা তিনি ঋষিতুল্য দিব্য চক্ষুতে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তিনি সাধারণ জনসমাজের অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত ছিলেন। তিনি নূতন জাতি-গঠনের কাল অদূরে দেখিয়া একটী একীকরণ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এবং মাতার আগমনী গাহিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় তাঁহারও অনেক পূর্ব্বে ভারতীয় স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বভাষ দেখিতে পাইয়া ছিলেন; এইজন্য চৈতন্য, নানক, কবীর প্রভৃতি মহাপুরুষগণের পন্থা অনুসরণ করিয়া, হিন্দুসমাজকে বিজাতীয় ধর্ম্ম এবং সভ্যতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমানের উপযোগী এক স্বাভাবিক সংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ইতিহাস-বিজ্ঞান ও মানবজাতির আশা

কতকগুলি ঐতিহাসিক সমস্যা

মানবের ইতিহাসে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় এক নূতন ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য প্রাণপণে আন্দোলন করিতেছেন, ফলে হয়ত এক অভিনব রাষ্ট্র বা প্রবল পরাক্রান্ত সামরিক জাতির সৃষ্টি হইল। অথবা হয়ত সমাজের রাষ্ট্রীয় বা বৈষয়িক উন্নতিসাধন করিয়া স্বদেশকে উচ্চতর সোপানে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য রাজা বা প্রকৃতিপুঞ্জ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন, দেখিতে দেখিতে এক বিচিত্র কর্ম্মকাণ্ডবিশিষ্ট অভিনব ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া প্রাচীন দেবতত্ত্ব ও ধর্ম্মজীবনকে নূতনভাবে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল।

অনেক সময়ে কতকগুলি বিষয় লইয়া রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে দ্বন্দ্ব বাধে; কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ের মীমাংসা করিয়া সন্ধি স্থাপিত হয়। কোনও এক রাজ্যের সিংহাসন শূন্য হইল, অথচ বিশ্বব্যাপী তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ হইয়া সমগ্র ভূখণ্ডের রাষ্ট্রীয় সীমাগুলির পরিবর্ত্তন সাধন করিল। কোনও দুই নরপতি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রহিয়াছেন,

কিন্তু ইতিমধ্যে অন্যান্য সমাজ ধীরে ধীরে নিঃশব্দে রাষ্ট্র-সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে।

আবার বিজ্ঞানচর্চ্চা, জ্ঞানানুশীলন, শিক্ষার গণ্ডি-বিস্তার প্রভৃতি মানসিক জগতের কার্য্য লইয়া দার্শনিকেরা ব্যস্ত আছেন,—ফল হইতেছে স্বরাজ, স্বাধীনতা ও প্রজাসাধারণের স্বায়ত্তশাসন। এদিকে রাষ্ট্রনৈতিকেরা ব্যবস্থাপক সভার সভ্যনির্ব্বাচনের প্রণালী নির্দ্দেশ, রাজা-প্রজার সম্বন্ধনির্ণয়, শাসনকর্ত্তাদিগের কর্ত্তব্য ও অধিকার-নির্দ্ধারণ প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় সমস্যা লইয়া ব্যাপৃত, কিন্তু সমাজে স্বাধীন চিন্তা, সংশয়বাদ ও বিজ্ঞানচর্চ্চা প্রবেশলাভ করিয়া নবযুগের সূচনা করিতেছে।

সূত্রপাতে যাহা দেখা যায়, শেষে অনেক সময়ে তাহার কোনও চিহ্ন লক্ষিত হয় না। এইরূপে শিল্পের উন্নতি ও ব্যবসায়ে অর্থলাভ করিবার আশায় উৎসাহিত হইয়া লোকে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে, অথচ অল্প কালের মধ্যেই সমাজশক্তির নূতন সমাবেশ হইয়া রাষ্ট্রের আকৃতি পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছে। আবার অনেক সময়ে রাষ্ট্রের উন্নতিসাধনই উদ্দেশ্য রহিয়াছে; কিন্তু ফল হইয়াছে—ব্যবসায়ে সম্পদ্‌লাভ। একজন ইচ্ছা করিলেন ধর্ম্মে ঐক্য, ফল হইল শিল্পের সর্ব্বনাশ! কখন বা

প্রকৃতিপুঞ্জের অধিকার বৰ্দ্ধিত এবং রাজার ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিবার অভিপ্রায়ে স্বদেশহিতৈষিগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এমন সময়ে অল্পকালের মধ্যেই সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও ঐক্য ঘোষিত হইল। কোনও এক দেশের রাজা ভুল করিলেন, ফল হইল অন্য এক রাষ্ট্রে বিপ্লব এবং রাজতন্ত্রের খর্ব্বতাসাধন। দুই রাষ্ট্রে যুদ্ধ বাধিল, কিন্তু স্বতন্ত্র এক স্বাধীন রাজ্য খণ্ডীকৃত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রভুক্ত হইয়া গেল।

উত্থান পতনের নিয়ম

মানব-জগতের মধ্যে প্রকৃতির এইরূপ খেয়াল দেখিয়া মানবীয় উন্নতি অবনতির কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে কি না স্বভাবতই মনে এই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। জাতীয় অভ্যুত্থান ও পতন, ধর্ম্মের প্রচার, শিল্পের বিনাশ, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতার-লোপ, স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি মানবের সকল ব্যাপারই যদি অদ্ভুত এবং আকস্মিক ঘটনার ফলে সংঘটিত হয়, তাহা হইলে কোন্ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, কোন্ আশায় উৎসাহিত হইয়া মানব জীবনসংগ্রামে বহির্গত হইবে? উন্নত লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাতি কি উপায়ে তাহার মর্য্যাদা ও গৌরব স্থায়ী করিবে? কোন্ সহায় অবলম্বন করিয়া পশ্চাৎপদ ও অবনত সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর

হইবে ? কর্ম্মিগণের আন্দোলনসমূহের কোন ফল আছে কি না ? ধর্ম্মপ্রচারক, সমাজসংস্কারক ও স্বদেশহিতৈষি-গণের যত্নের মূল্য কি ?

ইতিহাসের গণ্ডী

মানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এইরূপ বিচিত্র প্রশ্নের উত্তর আমরা ঐতিহাসিকের নিকট আশা করি। কিন্তু আজকাল জ্ঞানচর্চ্চা শ্রমবিভাগনীতির অতিশয় অধীন হইয়া পড়িয়াছে। জটিল সমস্যাগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বতন্ত্র আলোচনাপ্রণালী অবলম্বনের প্রতি সাহিত্যের গতি ধাবিত হইয়াছে। ইহাতে বিভিন্ন বিজ্ঞানগুলি ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ ও বিশিষ্টতাপ্রাপ্ত হইয়া উঠিতেছে। এই সঙ্কীর্ণতা ইতিহাস-সমালোচনায়ও প্রবিষ্ট হইয়া ইহাকে কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ঘটনাবলীর বিবরণরূপে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছে। ইতিহাস-ক্ষেত্রের বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ আজকাল রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধ, রাষ্ট্রের শাসনপ্রণালী, সন্ধিবিগ্রহ, রাজ্যবিস্তার, রাজ্যক্ষয়, জয়পরাজয়, এক-রাষ্ট্রীয়তার বিকাশ ও লোপ প্রভৃতি বিবিধ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারগুলি আলোচনার জন্যই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া এই নির্দ্দিষ্ট গণ্ডিতেই

শ্রমবিভাগ নীতি

তাঁহাদের সমগ্র শক্তি ও সময় প্রয়োগ করেন। পরিবার, সমাজ, শিল্প, ধর্ম্ম, সাহিত্য প্রভৃতি দ্বারা রাষ্ট্রের উপর মানবের যে কার্য্য হইয়া থাকে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা-সমূহের ফলে মানবের জীবন যে যে বিচিত্র উপায়ে রূপান্তরিত হয়, সেই সমুদয়ের আলোচনার জন্য ঐতি-হাসিকেরা স্বতন্ত্র কর্ম্মিগণের উপর নির্ভর করেন।

এই শ্রমবিভাগনীতির ফলে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যাগুলি ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া অতি সত্বরই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে বটে এবং ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতাবিধানে যথেষ্ট সহায়তা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু এরূপ অনৈক্য-বশতঃ সমগ্র জ্ঞেয় জগতের নিয়ম ও শৃঙ্খলা আবিষ্কারের পক্ষে অসুবিধা হয়। ইতিহাস ইহার ফলে প্রকৃত রাষ্ট্র-বিজ্ঞান গঠনের ভিত্তি ও উপকরণসমূহ প্রদান করিয়া মানব-জগতের বিশেষ এক বিজ্ঞানের সূত্রপাত করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সমগ্র মানবের আশা, ভরসা, উন্নতি অবনতি, লাভালাভ প্রভৃতির নিয়মগুলি আয়ত্ত করিবার দিকে বিশ্বজগতের মনোযোগ শিথিল হইয়াছে।

মানব কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় জীব নহে। সুতরাং একমাত্র রাষ্ট্রই মানবের লক্ষণ বা পরিচয় এবং সুখ দুঃখের

ব্যাপকভাবে আলোচনার আবশ্যকতা

পরিমাপক নহে। মানবের সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান, বৃত্তি ও প্রবৃত্তির পরিচয় গ্রহণ না করিলে মানব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ হইতে পারে না। এজন্য সমগ্র মানব-জীবনের আলোচনা না করিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে এবং মানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উপদেশাদি ইঙ্গিত করিতে অসমর্থ হইবে। জীবনীশক্তির বিকাশ ও জীবনের বিবিধ অভিব্যক্তির নিয়ম আলোচনা করিবার জন্য যে স্বতন্ত্র প্রাণবিজ্ঞান ও জীবনতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, প্রতিপদে ঐতিহাসিককে সেই বিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাণবিজ্ঞানই প্রকৃত ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞানের ভিত্তি। এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়া ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। তাহা হইলেই মানবজীবনের গতি, মানবসমাজের ক্রমবিকাশ, মানব-চিত্তের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট ও নিশ্চিত হইতে পারিবে।

প্রাণ-বিজ্ঞান

জীবনীশক্তির সহায়ক এবং জীবনের পরিপোষক কতকগুলি শক্তি ও পদার্থের দ্বারা প্রাণিমণ্ডলীর অন্তর্গত

প্রত্যেক জীবের বিকাশ সাধিত হয়। এই পদার্থগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য প্রাণী পারিপার্শ্বিক বেষ্টনীর অধীনতা স্বীকার করে। পরিদৃশ্যমান প্রাকৃতিক জগৎ জীবের কেবল পরিপোষকমাত্র নহে। ইহা তাহার কর্ম্মক্ষেত্র, বিকাশ ও বংশবিস্তারের নিকেতন। সুতরাং জীবের সহিত বেষ্টনীর সম্বন্ধই তাহার জীবনের সকল অবস্থার নিয়ন্তা।

বিশ্বের প্রভাবে প্রাণীর স্বভাব গঠন

আলোক, তাপ, জল, বায়ু, আহার্য্য প্রভৃতি যে সকল পদার্থ ও শক্তির সমুচ্চয়ে এই বেষ্টনীর সৃষ্টি তাহাদের মধ্যে সকলগুলিই প্রত্যেক জীবের পক্ষে সমান প্রয়োজনীয় নহে। আবার এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই এমন কতকগুলি শক্তি ও পদার্থ আছে, যাহার দ্বারা জীবের অনিষ্টও সাধিত হইতে পারে। প্রত্যেক জীবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য বহুবিধ জীবেরও সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্বের সর্ব্ববিধ প্রতিকূল ও অনুকূল শক্তির সমন্বয়ের ফলেই প্রত্যেক জীব তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে পারে। এজন্য প্রাণীর আকৃতি ও প্রকৃতি এই সমুদয়ের প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর আকৃতিবৈচিত্র্য, বর্ণপরিবর্ত্তন, বিভিন্ন গঠনপ্রণালী, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভাবভঙ্গী, সন্তানরক্ষা-পদ্ধতি সকল বিষয়ই এইরূপ বেষ্টনীর প্রভাবে পরিচালিত হয়। জলজ ও স্থলজ জীবের আবাসভূমি বিভিন্ন, ইহাদের জীবনধারণপ্রণালীও বিভিন্ন। এজন্য ইহাদের আকৃতির মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। আবার স্থলজ প্রাণীসমূহও বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রতিকূল ও অনুকূল শক্তিপুঞ্জের মধ্যে বিকাশলাভ করে বলিয়া বিভিন্ন আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রাণীর পারিপার্শ্বিক শক্তিসমূহ বিশ্লেষণ

কোন এক জীবের জীবনধারণ ও বংশবিস্তার কেবল-মাত্র তাহার নিজের উপর নির্ভর করে না। ফলতঃ সকল বিষয়ই বেষ্টনীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সমগ্র বিশ্বের সর্ব্ববিধ শক্তি যে ভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহাদিগকে ব্যবহার করিয়া নিজের অঙ্গীভূত করিবার যে সমুদয় প্রয়াস চলিতেছে, এবং নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেষ্টনীর প্রভাবে যেরূপ পরিচালিত হইতেছে, সকলগুলির ফলেই প্রত্যেকের জীবন ও শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়। অন্যান্য জীব তাহাদের নিজের পুষ্টিসাধনের জন্য যে প্রয়াস করিতেছে, জীবসমূহের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা

সংখ্যের প্রভাবে জীবজগতের যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রাকৃতিক বিশ্বে এই জীবনধারণ লইয়া অনবরত যে সংগ্রাম চলিতেছে এবং তাহার দ্বারা যে বিচিত্র শক্তির পরস্পর বিকাশ ও বিনাশ সাধিত হইতেছে, তাহাতে সকলগুলির ফল পুঞ্জীভূত হইয়া এক একটী জীবের জীবনে ও শরীরপোষণে সহায়তা করিতেছে। কোন জীবই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিতে পারে না। প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক কার্য্য সমগ্র বিশ্বের অপরবিধ কার্য্যকলাপের অধীন। প্রত্যেকের জীবনমরণ ও স্বাধীনতা অন্যান্য সকলের জীবন মরণ ও স্বাধীনতার সহিত ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রাণিজগতের এই মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম না করিলে কোন জীবের জীবনের কোন অবস্থাই সুবোধ্য হইতে পারে না।

বিশ্বশক্তির প্রভাবে মানব চরিত্রের অভিব্যক্তি

মানবজীবনও এইরূপ পারিপার্শ্বিকের প্রভাবেই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। মানবের পুষ্টি, বিকাশ ও স্বাধীনতা বিশ্বের সর্ব্ববিধ শক্তিপুঞ্জের পরস্পর বৈরিতা ও মৈত্রীর উপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক ও সামাজিক জগতের প্রতিকূল ও অনুকূল উপকরণের মধ্যে যেরূপ

সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার ফলেই মানবের বিকাশ, পুষ্টি ও স্বাধীনতা।

মানবের সমাজস্থষ্টি, রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা, শিক্ষার ব্যবস্থা, সাহিত্যচর্চ্চা, বিজ্ঞানানুশীলন, ধর্ম্ম কর্ম্ম, প্রতিষ্ঠান-গঠন, সকল কার্য্যই এই বেষ্টনীর দ্বারা পরিচালিত হয়। পারিপার্শ্বিক ভাব ও শক্তিসমূহের পরিবর্ত্তন অনুসরণ করিয়া মানবজীবনের বিবিধ অভিব্যক্তি পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হয়। উদ্ভিদ্ ও ইতর জীবজন্তু যেমন বেষ্টনীর প্রভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রূপান্তর লাভ করে, বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া জীবনের বিবিধ লক্ষণ প্রকটিত করে এবং আকৃতির পরিবর্ত্তন বিধান করে, মানবও সেইরূপ বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়া জীবনের বিভিন্ন অভিব্যক্তির পরিচয় প্রদান করে, জীবনধারণের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে এবং বিভিন্ন আকৃতিতে জীবনের স্বাতন্ত্র্য ও পারম্পর্য্য রক্ষা করে। রাষ্ট্র, ভাষা, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ মানবের এই জীবনের অভিব্যক্তি—অবস্থাভেদে এই অভিব্যক্তিগুলির মৌলিক ও আকৃতিগত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

জীবনসংগ্রামের বিভিন্ন প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হইয়া মানব এই সমুদয় অঙ্গের বিভিন্নতা সাধন করে। সুতরাং

বেষ্টনী ও জীবনসংগ্রাম যেমন উদ্ভিদাদি নিকৃষ্ট জীবের গঠন, জীবন, গতিবিধি, বিকাশ, বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিষয়ের বৈচিত্র্য সম্পাদন করে, সেইরূপ এই বিশ্বের পারিপার্শ্বিক শক্তিগুলির দ্বারা এবং জীবনসংগ্রামের প্রয়োজনেই মানবের সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, শিল্প, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত্তন, বিভিন্নতা ও বৈচিত্র সাধিত হয়। সুতরাং মানবের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন বা ধর্ম্মপ্রচার, উপনিবেশ স্থাপন ও শিল্পপ্রতিষ্ঠা সকল ব্যাপারই সমগ্র বিশ্বের সর্ব্ববিধশক্তির কার্য্যফলে সাধিত ও নিষ্পন্ন হয়। কোন জাতির জীবন, মরণ, স্বাধীনতা, পুষ্টি ও বিকাশ তাহার স্বকীয় ইচ্ছা ও প্রয়োজন মাত্রের উপর নির্ভর করে না। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা দ্বারা সমগ্র মানব-সমাজের ভারকেন্দ্র যে স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেই বিশ্বব্যাপী ঘটনাচক্রের দ্বারাই প্রত্যেক জাতির উন্নতি, অবনতি, ধ্বংস ও উৎপত্তি, স্বাধীনতা ও পরাধীনতা পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং কোন এক-জাতির কোন এক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সমগ্র মানবসমাজের মধ্যে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ধর্ম্মবিষয়ক, ও

মানবের পারিপার্শ্বিক শক্তিসমূহ বিশ্লেষণ

চিন্তা সম্পর্কীয় সর্ব্ববিধ আদানপ্রদানের ফলে জগতের শক্তিগুলি যেরূপভাবে সজ্জিত রহিয়াছে, সেই বিরাট্ শক্তিসমুচ্চয়ের সংঘটনগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে হইবে।

পৃথিবীর কোন পদার্থ অস্বীকার করিয়া কোন মানবই থাকিতে পারে না। এজন্য প্রত্যেক মানবকে অপর সকল মানবের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। এজন্য প্রত্যেক মানবকে তাহার শত্রু ও মিত্রের সংখ্যা গণনা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়। কোন্ চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি কোন্ কোন্ অবস্থায় মানবসমাজের বিভিন্ন জাতির অনুকূল, এবং কোন্ কোন্ চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি তাহার প্রতিকূল, এই সমুদয়ের স্থিরীকরণই জীবন-সংগ্রামের প্রধান কার্য্য। ইহারই উপর তাহার জীবন-ধারণোপযোগী এবং উন্নতিবিধায়ক আয়োজনসমূহ নির্ভর করে।

মানবসমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক জাতির উৎকর্ষ অনুৎকর্ষ সমগ্র মানবেতিহাসের পরিণতির গৌণ লক্ষণ ও পরিচয়। কোন জাতি তাহার নিজের জীবন ও স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে যাহা মুখ্য ও অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে করে, তাহা বিরাট্ মানবসমাজের

জাতীয় উন্নতি ও বিশ্বসভ্যতার সম্বন্ধ

সাধারণ জীবনপ্রবাহের আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। যদি কোন দেশের ভাষার উন্নতি বা অবনতি সাধিত হয়, অথবা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত বা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই লাভ ও ক্ষতির দ্বারা সেই সমাজের স্বকীয় ভাগ্য গঠিত হইয়া যাইবে বটে; কিন্তু এই বিকাশ ও বিনাশ বহুজাতির অভ্যুদয় ও পতনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সভ্যতা

প্রাচীন মানবের পারিপার্শ্বিক শক্তিসমূহ বিশ্লেষণ

প্রাচীন জগতে ভারতবর্ষ, পারস্য, চীন, মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশ জ্ঞান ও সভ্যতার কেন্দ্র হইয়া বিরাজ করিতেছিল। এই সমুদয় সভ্যজাতির উৎকর্ষ অন্যান্য সভ্য ও অসভ্য জাতির উৎকর্ষ ও অনুৎকর্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থানের জল বায়ু, আহার্য্য প্রদানের শক্তি, শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করিবার সুযোগ প্রভৃতি বিচিত্র কারণে কোন দেশের স্বাধীনতা, কোন জাতির পতন, কোন সমাজের পরাধীনতা এবং কোন জনপদের অধোগতি সাধিত হইয়াছিল। ইহারই ফলে বিরোধ, সংগ্রাম, সন্ধি, মিশ্রণ,

বিবাহ, ধর্ম্মান্তরগ্রহণ, ধর্ম্মত্যাগ, রাজ্যলাভ, শিল্পপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি মানবীয় সকল বিষয়েরই গতি স্থিরীকৃত হইয়াছিল। ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয়দিগের প্রত্যেক কার্য্যে তাহাদের এই জাতিগত সংঘর্ষণ, মিলন ও বিরোধের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গ্রীসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি পারস্য-সম্রাটের রণনীতি এবং বিবিধ অনার্য্যভাষাভাষিগণের গতিবিধি অনুসরণ করিত। রোমীয়দিগের ভাগ্য ফিনিসীয়, গ্রীক এবং বহু অপরিচিত সমাজের ক্রিয়াকলাপ ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বিচিত্রভাবে গঠিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষও এইরূপে চীন, তিব্বত, গ্রীকরাজ্য ও বিবিধ অনার্য্য দেশীয় লোকসমাজের ধর্ম্মবিষয়ক, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক রীতিনীতির প্রভাবের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। আলেকজাণ্ডার যে সমুদয় রাজ্য নূতন গঠন করিয়াছিলেন, তাহারা যেরূপ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বেষ্টনীর মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছিল, সেইরূপ শক্তি অনুসারে পার্থক্য লাভ করিয়া পরবর্ত্তী যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও শিল্পসম্পর্কীয় উৎকর্ষের সূচনা করিয়াছিল। প্রত্যেক প্রাচীন জাতির জাতীয়তা ও বিশেষত্ব এইরূপে অন্যান্য জাতির জাতীয়তা ও

বিশেষত্বের সহিত সম্বন্ধ হইয়াই স্বাতন্ত্র্য ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

প্রাচীন যুগের ন্যায় মধ্যযুগেও মানবজাতির কর্ম্ম-ক্ষেত্রে যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাও এইরূপ পরস্পর সংঘর্ষ ও মিশ্রণের ফল। যে সকল অসভ্য, অনার্য্য বা বর্ব্বর জাতি সভ্যজগতের পার্শ্বে থাকিয়া উন্নত জাতিসমূহের যুগপৎ সাহস ও ভীতির কারণ হইয়াছিল, যাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া সভ্যসমাজ একমুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারে নাই, তাহারাই নূতন শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া প্রাচীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাতির সঙ্গে সমকক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

মধ্যযুগের বিশ্বশক্তি

জীবন-সংগ্রামের ফলে একদিকে টিউটন সমাজ অন্ন-সংস্থানের জন্য স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া নূতন আবাস, নূতন জনপদ সন্ধানের নিমিত্ত বহির্গত হইল।

টিউটন জাতি

অপর দিকে আরব মরুভূমির এক প্রচারক নূতন দেবতত্ত্ব প্রকাশ করিলেন, আর অমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ একীভূত হইয়া ধর্ম্মের জন্য দিগ্বিজয় আরম্ভ করিল। নববলে বলীয়ান্ এই দুই সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া অন্যান্য স্থানের অধিবাসিবৃন্দ আকস্মিক

ইস্‌লাম ধর্ম্ম

উৎপাতের প্রভাব সহ্য করিতে বাধ্য হইল। ফলে এসিয়া ও ইউরোপের প্রাচীন জনপদগুলি নূতনভাবে অনুরঞ্জিত হইয়া নূতন সভ্যতা গঠনের সূত্রপাত করিল।

ইউরোপ ও এসিয়ায় বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সীমাগুলি নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। রোমীয় সাম্রাজ্যের অধোগতি, নূতন রাষ্ট্রের গঠন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতালাভ, বিবিধ ধর্ম্মসংগ্রাম, ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উৎপত্তি, স্বাধীনতা ও বিদ্রোহ, মুসলমান রাজ্যের সৃষ্টি, বিভিন্ন জাতির ধর্ম্মান্তরগ্রহণ ও স্বাধীনতালোপ— সকল বিষয়ই এক বিরাট সমাজদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র। নূতন জাতির স্বাধীনতা প্রাচীন জাতির পরাধীনতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। পূর্ব্বে যাহারা "বর্ব্বর" নামে অভিহিত হইত, তাহারা যেমন ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলিকে ক্রমে ক্রমে করতলগত করিয়া প্রাচীন রোমীয় সাম্রাজ্যের বিনাশসাধন করিতেছিল, এসিয়াতে সেইরূপ এক নগণ্যজাতি প্রতিষ্ঠা লাভ দ্বারা সমগ্র সভ্যজগতের রাষ্ট্রগুলি পদানত করিয়া নূতন নূতন রাজ্য গঠন করিয়াছিল। ভারতীয় প্রদেশগুলির মুসলমান বিজয়, টিউটন কর্ত্তৃক

রোমীয় সাম্রাজ্য

এসিয়ার বিভিন্ন সাম্রাজ্য

ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি বিজয়ের অনুরূপ। কোন দেশের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা কেবলমাত্র সেই দেশবাসী লোকের উপর নির্ভর করে নাই। জাতীয় উন্নতি অবনতি, স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব সমগ্র মানব-সমাজের সাধারণ বিকাশের ফল।

বর্ত্তমান যুগে বিশ্বশক্তির প্রভাব ও বিভিন্ন জাতির ভাগ্যগঠন

আধুনিক কালে স্বাধীনতা বা প্রজাসাধারণের স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে কয়েকটী দেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছে, তাহাদেরও ভাগ্য এরূপ পারিপার্শ্বিক শক্তি-সমূহের পরস্পর সহায়তা ও আততায়িতার ফলে সংগঠিত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে স্পেন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ওলন্দাজ জাতির স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়া ইউরোপের রাষ্ট্রীয় জগতে নূতন শক্তির প্রাদুর্ভাব ঘটাইয়াছিল। কিছুকাল হইতে স্পেন-সাম্রাজ্যের অবনতি হইয়া আসিতেছিল।

হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সমগ্র ইউরোপের দান

ইহার একচ্ছত্র সাম্রাজ্যভোগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ফ্রান্সের নরপতিগণ ইহাকে খর্ব্বাকৃতি ও খণ্ডীকৃত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। এই সময়ে

ফরাসী নরপতি ইউরোপের অন্যান্য জাতির শক্তি-নাশপূর্ব্বক স্বকীয় আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন, সুতরাং স্পেন-সম্রাটের স্বাভাবিক শত্রু হইয়া পড়িলেন। জর্ম্মান সম্রাট্ স্পেনীয় সম্রাটের নিকট আত্মীয় ছিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে উভয়ের মধ্যে একমত ছিল না। এই ধর্ম্ম লইয়া ইংলণ্ডের অধীশ্বরী এলিজাবেথের সঙ্গেও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল।

এদিকে ফিলিপের ধর্ম্মনীতির নির্য্যাতন-প্রভাবে স্পেন-সাম্রাজ্য হইতে শিল্পনিপুণ ব্যবসায়ীরা দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় রাষ্ট্রের অর্থশক্তি হীন হইয়া গিয়াছে। অধিকন্তু যে সময়ে উৎপীড়িত ওলন্দাজেরা উপযুক্ত বীরপুরুষ-দিগের নেতৃত্বে স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হয়, সেই সময়ে ফ্রান্সের সহিত মনোমালিন্য ও ইংলণ্ডের সঙ্গে সমর বাধিয়া স্পেনের শক্তি বিভক্ত হইয়া গেল। কাজেই স্পেনের অবনতি, ফ্রান্সের অভ্যুদয়, ইংলণ্ডের শিল্পপ্রতিষ্ঠা, ওলন্দাজদিগের ধর্ম্ম ও দেশরক্ষা এক বৃন্তে বহু ফলের ন্যায় গ্রথিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। ইহাদের কোনটাই অপরগুলির সহিত সম্বন্ধহীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

স্পেনের অধোগতি এবং ওলন্দাজদিগের স্বাধীনতা

যেমন সমগ্র ইউরোপখণ্ডের সমবেত স্বার্থসিদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, তেমনি ফ্রান্সের চতুর্দ্দশ লুইয়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সমগ্র ইউরোপকে যথেচ্ছাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য অরেঞ্জবংশীয় উইলিয়ম সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে বিরাট্ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহারই একটী গৌণফল স্বরূপ ইংলণ্ডের দ্বিতীয় জেম্‌সের রাজ্যচ্যুতি এবং প্রজাসাধারণের স্বায়ত্তশাসন সংঘটিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের এই গৌরবময় বিপ্লব ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে ইংরাজ জাতির স্বকীয় প্রয়োজন সাধনের জন্য সাধিত হয় নাই।

ইংলণ্ডের প্রজাতন্ত্র-শাসন প্রতিষ্ঠা ইউ-রোপীয় জীবনপ্রবাহের একটি গৌণ ফলমাত্র

সমগ্র ইউরোপ এমন এক অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল যে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের নেতা স্বয়ং পোপও তাঁহারই পৃষ্ঠপোষক ইংলণ্ডের রাজার বিরুদ্ধতাচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জর্ম্মান্ সম্রাট্ তখন তুরস্কের সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত, স্পেনের শক্তি অনেকদিনই খর্ব্ব হইয়াছে। চতুর্দ্দশ লুই এই সুযোগে সমগ্র ইউরোপ গ্রাস করিবার আয়োজন করিতেছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারে এরূপ কোন সমাজের তখন অস্তিত্ব ছিল

না। এক ক্ষুদ্র সমাজের অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন বীরপুরুষ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন; কিন্তু অর্থ ও সেনাবলের অভাব। সুতরাং ইংলণ্ডে যে সমস্ত বৈষয়িক ও সামাজিক সুবিধা আছে, তাহার প্রয়োগ করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল। এইজন্য ইংলণ্ডে রাজায় প্রজায় যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তাহার মীমাংসা হইবার পূর্ব্বে মানবের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইল না। কাজেই ইংলণ্ডের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনপ্রতিষ্ঠাই উইলিয়মের জীবন-সংগ্রামে প্রধানতম লক্ষ্য হইয়াছিল।

ইউরোপীয় ধর্ম্ম সংগ্রামের প্রকৃত পরিচয়

ষোড়শ শতাব্দীতে মার্টিন লুথার নূতন ধর্ম্মের প্রচার করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ধর্ম্ম-আন্দোলনের শেষ অধ্যায় প্রকটিত হয়। কেবলমাত্র মানবকে নূতন ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য ইউরোপের কোন দেশেই প্রাচীন ও নবীন ভাবের দ্বন্দ্ব ঘটে নাই। পোপের রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক ক্ষমতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া ইউরোপের অন্যান্য নরপতি ও অধিবাসিবৃন্দ যেরূপভাবে সম্মিলন বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন, প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় কর্ম্মী স্বকীয় স্বাধীনতা ও অর্থলাভ এবং বৈষয়িক উন্নতিবিধানের চেষ্টায় যেরূপ আন্দোলন করিতেছিলেন,

তাহার ফলে ইউরোপের কর্ম্মক্ষেত্রে জাতিগুলি বিভক্ত ও সজ্জিত হইয়া পরস্পর শক্তিপ্রয়োগ করিতেছিল। ইহাতে কেবলমাত্র ধর্ম্মপ্রচারকেরই স্থান ছিল না ; ফ্রান্স, জার্ম্মানি এমন কি সুদূর সুইডেনও ধর্ম্মসংগ্রামের আবর্ত্তে পতিত হইয়া নূতন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠার সংঘটনের ব্যবস্থা করিতেছিল। যখন সন্ধি স্থাপিত হইল, তখন দেখা গেল কেবলমাত্র ধর্ম্মের ব্যবস্থাই হইয়াছে তাহা নহে, অধিকন্তু স্পেন, ফ্রান্স, প্রসিয়া, সুইডেন, হলাণ্ড প্রভৃতি সকল দেশেরই রাষ্ট্রীয় সীমাগুলিও নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

আধুনিক প্রসিয়া ও রুষিয়ার অভ্যুদয়ের জন্য সমগ্র ইউরোপের দায়িত্ব

সুইডেনের অভ্যুদয় ও ক্রমিক অবনতি, প্রসিয়ার বিকাশ ও ক্রমোন্নতি, এবং রুষিয়ার সমৃদ্ধিলাভও এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংঘর্ষণের ফলে সাধিত হইয়াছিল। ইউরোপে যখন স্পেন ও জর্ম্মানবংশীয় নরপতিগণের স্থান অধিকার করিয়া ফরাসীজাতি উন্নত হইতেছিল, সেই সুযোগেই প্রসিয়া ও রুষিয়ার অভ্যুদয় ঘটিতেছিল। জর্ম্মানেরা ফরাসী ও তুরস্কদিগের সহিত যখন কর্ম্মক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল, সেই সময়ে ইউরোপের সুদূর প্রান্তবাসী শ্লাভনীয় জাতি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি ক্রমশঃ আয়ত্ত

করিয়া, রুষিয়া ও প্রসিয়া যখন ইউরোপের রাষ্ট্রীয় জীবনে নবশক্তিরূপে স্থান প্রাপ্ত হইল, তখন হইতেই সুইডেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া ও তুরস্ক প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যের কর্ম্ম-ক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। জর্ম্মান সম্রাটের অবনতি, ধর্ম্মসংস্কারের সংগ্রাম ও নূতন নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠালাভ একই আন্দোলনের বিভিন্ন ফল।

তুরস্কের অধীনতা হইতে আধুনিক গ্রীসের উদ্ধার এইরূপে সমগ্র ইউরোপেরই সমবেত শক্তির ফলে সাধিত হইয়াছে। অল্পদিন হইল জর্ম্মানি ও ইটালীতে যে স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও ইংলণ্ড, তুরস্ক, রুসিয়া ও ফ্রান্সের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত প্রসূত। আধুনিক জর্ম্মানির সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা, ইটালীর জাতীয় গৌরব, ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রস্থাপন সকলগুলিই পরস্পরসাপেক্ষ। কোন বিপ্লবই স্বাধীনভাবে সাধিত হয় নাই।

ইউরোপের নবীন স্বাধীনজাতি

হাঙ্গারী দেশও যে ধীরে ধীরে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ হইতে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র এই দেশের অধিবাসি-বৃন্দের বীরত্বের প্রভাবে নহে। রুষিয়া, অষ্ট্রিয়া ও তুরস্কের মধ্যে বহুদিন হইতে যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, তাহার ফলেই

জর্ম্মাণ প্রদেশ হইতে অষ্ট্রিয়া বিতাড়িত এবং বিজিত হাঙ্গারি তাহার সহিত সমসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে।

তুরস্ক যে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইয়া এখনও ইউরোপের মানচিত্রে স্বকীয় বিশেষ স্থান রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার কারণ রুষিয়ার সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রীয়শক্তির বিরোধ। মধ্যযুগে যেমন রোমান ক্যাথলিক জগতের বিধাতা পোপও বৈষয়িক স্বার্থের বশীভূত হইয়া বিরুদ্ধ ধর্ম্মোপাসক নরপতিগণকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাহায্য করিতেন এবং প্রবল পরাক্রান্ত রোমান ক্যাথলিক সম্রাট্‌কেও হীন করিবার চেষ্টা করিতেন, আধুনিককালেও সেইরূপ খৃষ্টান রুষিয়াকে খর্ব্ব করিবার জন্য, ইউরোপের অন্যান্য খৃষ্টানজাতি মুসলমান তুরস্কের এবং এসিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের বন্ধু হইয়া উঠিয়াছেন।

এসিয়ার স্বাধীনতা

প্রকৃত কথা এই—কোন ব্যক্তি সমগ্র প্রাকৃতিক ও মানবীয় জগৎকে অস্বীকার করিয়া একদণ্ডও জীবিত থাকিতে পারে না, সর্ব্বদাই তাহাকে নিজের বেষ্টনীর মধ্য হইতে উপযুক্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া কলেবর ও চিত্ত পুষ্ট করিতে হয়, এবং যতদিন তাহার এই শক্তি থাকে

জাতীয় স্বাধীনতা ও পরাধীনতা বিশ্বের সর্ব্ববিধ শক্তির অধীন

ততদিন তাহার জীবনের বিকাশ হয়। সেইরূপ কোন জাতিই অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং তাহাদের সহিত নিজের সম্বন্ধ বিবেচনা না করিয়া একদণ্ডও মানব-জগতে স্থির থাকিতে পারে না। কোন জাতির স্বাধীনতা ও উন্নতি কেবলমাত্র সেই দেশীয় বীরপুরুষগণের চেষ্টায়—তাহাদেরই বাহু ও চরিত্রবলে সাধিত হইতে পারে না। সকলকেই সমসাময়িক জগতের রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক শক্তিগুলির সমাবেশ পর্য্যালোচনা করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ ও গতি স্থির করিতে হয়। এই উপায়ে সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্ববিধ শক্তির প্রভাবে প্রত্যেক জাতির বিচিত্র ভাগ্য গঠিত হইয়াছে বলিয়া অনেক সময়ে বহু ঘটনা আকস্মিক ও অদ্ভুত বোধ হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় উন্নতি অবনতির মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়মের অভাব নাই।

বিশ্বশক্তির প্রভাব এবং রাষ্ট্রের আকৃতি ও প্রকৃতি

রাষ্ট্রশাসনপ্রণালীও এইরূপে পারিপার্শ্বিক শক্তি-পুঞ্জের দ্বারাই গঠিত হয়। রাষ্ট্রের উৎপত্তি মানবের সুবিধার জন্য ; সুতরাং রাষ্ট্রকে সমাজের বিবিধ অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির মধ্যে

প্রজার অধিকার

থাকিয়া কার্য্য করিতে হয়। এই কারণে রাষ্ট্রশাসনপ্রণালী পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুরূপ হইয়া থাকে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রকৃতিপুঞ্জের রাষ্ট্রীয় অধিকার অনেক বেশী হইবার কারণ এই যে, বিদেশীয় শত্রু হইতে এই দুই দেশের শাসনকর্ত্তাদিগকে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিশেষ চিন্তান্বিত হইতে হয় না, ইহারা প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারাই সুরক্ষিত।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লুপ্ত হইবার আশা অত্যধিক ছিল বলিয়া চতুর্দ্দশ লুইকে সমীপবর্ত্তী জাতিসমূহ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য শাসনপ্রণালী অতি কঠোর করিতে হইয়াছিল। প্রসিয়াও যখন প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিল, তখন ইহার চতুঃপার্শ্বেই শত্রু বিরাজমান। এজন্য প্রসিয়ার নরপতিগণকে প্রথম হইতেই অতি সাবধানে রাজকার্য্য সমাধা করিতে হইত। ইহার ফলে প্রজার অধিকার খর্ব্বীকৃত ও শাসনকর্ত্তাদিগের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

একচ্ছত্র সাম্রাজ্য-নীতি

ইউরোপের মধ্যযুগে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হইবার প্রধান কারণ এই যে, সকল রাজ্যেরই ঐক্য ও স্বাধীনতা প্রবল পরাক্রান্ত রাজার অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অনৈক্য নিবারণ এবং ধনী সম্প্রদায় ও ভূম্যধিকারীদিগের রাজ্য-

লিপ্সা খর্ব্ব করিয়া নূতন রাষ্ট্রীয় জীবন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এইরূপ প্রবল রাজতন্ত্রের আবশ্যক হইয়াছিল। সুতরাং কি ফ্রান্স, কি ইংলণ্ড, কি স্পেন, এবং পরবর্ত্তীকালে প্রসিয়া এবং রুষিয়াও ধর্ম্ম, শিক্ষা, ব্যবসায়, সমাজ, সভ্যতা প্রভৃতি সকল বিষয়েই প্রজার স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

ভারতে ব্যক্তিত্ব বিকাশ

কিন্তু বিশাল ভারতমহাদেশের বিভিন্ন সমাজগুলিকে রাষ্ট্রীয় বিধানের দ্বারা ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিবার সুযোগ ছিল না বলিয়া, এখানে প্রাচীন গ্রাম্যজীবনের স্বাধীনতা ও সামাজিকতা রক্ষা পাইয়াছেন।

আন্তর্দ্দেশিক অবস্থার প্রভাবে রাষ্ট্রের প্রকৃতিগঠন

বিদেশীয় রাষ্ট্র হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যেমন প্রত্যেক রাষ্ট্রকে সাবধান হইতে হয়, সেইরূপ স্বদেশীয় বিদ্রোহ-দমন ও অশান্তি-নিবারণের জন্যও সকল শাসন-কর্ত্তাকেই প্রস্তুত হইতে হয়। স্পার্টার কঠোর শিক্ষা-নীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আন্তর্দেশিক হেলট জাতির শত্রুতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যে স্থানে প্রজা অতিশয় দুর্দ্দান্ত অথবা যে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা প্রতি মুহূর্ত্তেই লুপ্ত হইতে পারে, সেই দেশের শাসনকর্ত্তাদিগকে অতিশয়

কঠোর ব্যবস্থা করিতে হয়। যে জাতির মধ্যে বহুবিধ অনৈক্য, মতভেদ এবং অশান্তির কারণ বর্ত্তমান, যে দেশের অধিবাসিবৃন্দ কখনও একমত হইয়া কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হয় নাই, তাহার রাজা যথেচ্ছাচারী না হইলে শান্তিরক্ষা ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারেন না।

ফরাসীবিপ্লবের উপদেশ

ফরাসীবিপ্লবের ফলে নেপোলিয়নের আবির্ভাব, কিন্তু নেপোলিয়ন কার্য্য আরম্ভ করিলেন রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া। এই জন্যই যখন কোন বিপ্লবের আশঙ্কা করা হয়, তখন রাজনীতি প্রজার সহানুভূতি পরিত্যাগ করিয়া ভীতিসঞ্চারকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। প্রতিপদে সামরিক আইন, বিনাবিচারে দণ্ডদান প্রভৃতির ব্যবস্থা না করিলে দুর্দ্দান্ত প্রজা ভীত ও শান্ত হইতে পারে না। আবার এই জন্য যখন কোন বিপ্লব সাধিত হয়, তখন বিপ্লব-কারীদিগকে অতি কঠোর রাষ্ট্রশাসনপ্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। তাহা না করিলে প্রতিক্ষণেই পুরাতন রাষ্ট্রীয় দল সুযোগ পাইয়া নূতনের বিনাশ সাধন করিতে পারে। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে যতবার রাষ্ট্র-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, প্রত্যেক বারই এইরূপ পুরাতন দলের উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য নির্য্যাতনই নীতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

এমন কি যাঁহারা ধর্ম্মমত, সামাজিক মত অথবা রাজ্যের উন্নতি বিধানবিষয়ে নূতন নূতন সম্প্রদায় গঠন করিবার ইচ্ছায় শিষ্য ও ভক্ত সমবেত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকেও এইরূপ কঠোর শাসননীতি অবলম্বন করিতে হয়। স্বকীয় পুষ্টিসাধনের জন্য শক্তি সংহত ও সংক্ষিপ্ত করা প্রয়োজন। সুতরাং প্রথম অবস্থায় সেবকগণের মধ্যে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ প্রদান করিলে সম্প্রদায় একেবারে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইতে পারে। ক্যালভিনের ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং জেসুট ক্যাথলিকগণের মধ্যে এইরূপ কঠোর শিক্ষা ও শাসন-নীতি প্রচলিত ছিল।

সমাজবন্ধনে কঠোরতা

বিশ্বশক্তির প্রভাবে ধর্ম্ম ও সমাজের রূপান্তর পরিগ্রহ

পারপার্শ্বিক প্রভাবে কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় সীমা এবং রাষ্ট্রীয় আকৃতি ও প্রকৃতিই গঠিত হয়, এমন নহে। অন্যান্য জীবের জীবন এবং বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ভাবে রূপান্তরিত হয়, মানবজীবনের অন্যান্য অভিব্যক্তিগুলিও সেইরূপ, রাষ্ট্রীয় অভিব্যক্তির ন্যায় দেশ, কাল ও বেষ্টনীর বিবিধ শক্তিপুঞ্জ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

সপ্তম শতাব্দীতে মহম্মদ এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তখন রোমীয় ও পারস্য-সাম্রাজ্য কতকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সমষ্টি-মাত্র রূপে অতিশয় হীনাবস্থায় রহিয়াছিল। বিভিন্ন জাতিসকল মহম্মদের নূতন ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইল। এই ঐক্যে যে রাষ্ট্রীয় শক্তি গঠিত হইয়াছিল, তাহার ফলে এসিয়া ও ইউ-রোপের বহু রাষ্ট্র বিধ্বস্ত হইয়া নূতন মুসলমান সাম্রাজ্যের গঠনে সহায়তা করিয়াছিল। এইরূপে এক ধর্ম্মমত পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিল।

ইস্‌লামধর্ম্মে রাষ্ট্রীয় শক্তি

যীশুখৃষ্টের ধর্ম্মও এইরূপে প্রথম অবস্থায় উপাসক-মণ্ডলীর মধ্যেই ধর্ম্মমত রূপে পুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ এরূপ বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় প্রভাব লাভ করিয়াছিল যে রোমীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার সময়ে খৃষ্টান সম্প্রদায়ই প্রকৃত রাষ্ট্রের স্থান অধিকার করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের শাসনভার গ্রহণ করিল, এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপার-সমূহে অভ্যাগত টিউটন বিজেতৃগণকে সর্ব্ববিধ উপায়ে সাহায্য করিয়া নূতন নূতন শাসনপ্রণালীবিশিষ্ট রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যগঠনে সহায়তা করিয়াছিল। শার্লেম্যান এবং

খৃষ্টানধর্ম্ম ও বৈষয়িক সভ্যতা

অটো দি গ্রেটের ফ্র্যাঙ্কো-জর্ম্মান সাম্রাজ্য এইরূপ ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের সহায়তাতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কালে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আধিপত্য এতই প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল যে, ইউরোপের সকল দেশের রাজা এবং সম্রাট্‌গণ ধর্ম্মসমাজের নেতা পোপের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন। এই ধর্ম্মসমাজের রাষ্ট্রীয় প্রতাপই মধ্যযুগে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এবং সংগ্রামসমূহের মূলীভূত কারণ।

কেবল মাত্র নৈতিক ও ধর্ম্মবিষয়ক অভাব পূরণ করিবার জন্যই মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সমসাময়িক জগতের সামাজিক, বৈষয়িক, রাষ্ট্রীয় এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় অভাব-মোচনের জন্য অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয় নাই বলিয়াই দুই ধর্ম্ম-সমাজ সামরিক ও বৈষয়িক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়া মানবজগতের উন্নতিবিধানে সহায়তা করিয়াছিল।

আমাদের দেশেও বাবা নানকের শিখ-সম্প্রদায় ধর্ম্মের অভাব-মোচনের জন্য উত্থিত হইয়া ক্রমে অত্যাচার দমন এবং রাষ্ট্রীয় শান্তি ও সুব্যবস্থা বিধানের জন্য বৈষয়িক মুক্তি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় রণ-সমাজ, মিস্‌ল্‌ ও খাল্‌সাতে পরিণত হইয়াছে।

শিখ-সমাজ

বেষ্টনীর প্রভাবে জীবন সর্ব্বত্র একই রূপে অভি-ব্যক্ত হয় না। কেবল মাত্র রাষ্ট্র ও ধর্ম্মই জীবিত সমাজের লক্ষণ নহে। মানবজীবন কখনও কলাবিদ্যায়, কখনও সাহিত্যে, কখনও সংগ্রামে, কখনও বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বিকাশ লাভ করে। এই বেষ্টনীর প্রভাবেই দার্শনিকগণ কালে কালে বিচিত্র মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া যুগধর্ম্মের উপযোগী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। গ্রীক্ জগতের দর্শনবাদ জর্ম্মাণ দর্শনবাদের অনু-রূপ নহে। মধ্যযুগের রাষ্ট্রীয় ও দার্শনিক গবেষণা আধুনিক চিন্তার প্রতিকৃতি নহে। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন সমস্যার মীমাংসা করিতে হইয়াছে বলিয়া মনু, য়্যারিষ্ট-টল, এবং বেকনের মধ্যে পরস্পর বৈসাদৃশ্য রহিয়া গিয়াছে।

দার্শনিক মতবাদসমূহের বৈচিত্র্য ও তাহার কারণ

যেখানে কোন অভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে, সেইখানেই জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়া মানব কখনও রাষ্ট্রীয়, কখনও সামাজিক, কখনও সাহিত্যিক, কখনও ধর্ম্মবিষয়ক আন্দো-লনে জীবনের সার্থকতা লাভ করে। বিভিন্ন

মানবীয় আন্দোলন-সমূহের বৈচিত্র্য ও তাহার কারণ

শক্তিপুঞ্জের দ্বারা যেমন রাষ্ট্রের বিচিত্র আকৃতি ও প্রকৃতি গঠিত হয়, তেমনি বিচিত্রভাব ও প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া মানব বিচিত্র আন্দোলন করে। রাষ্ট্রীয় অবসানেও জীবনের অবসাদ হয় না। জীবনীশক্তি ধর্ম্মের ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া কখনও শিল্পে, কখনও ব্যবসায়ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া সাহিত্যে, কখনও বা রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের আন্দোলনে পরিস্ফুট হয়।

মানবীয় আদর্শ ও লক্ষ্যের রূপান্তর গ্রহণ

এই জন্য একই আদর্শ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে প্রজাসাধারণের স্বায়ত্ত শাসন ও অধিকার বিস্তার, ব্যবসায় ও বৈষয়িক ব্যাপারে সাম্যবাদ, সোস্যালিজ্‌ম্ ও প্রত্যেক ব্যক্তির পরিপূর্ণতা, ধর্ম্মে জীবমাত্রের আত্মার বিকাশ, সাহিত্যে ভাবুকতা এবং কলাক্ষেত্রে অতীন্দ্রিয়তার আকার ধারণ করে। ইহারই ফলে ফরাসীবিপ্লব-প্রসূত রাষ্ট্রীয়শক্তি সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া নিম্ন জাতির অধিকার ঘোষণা করিয়াছে, সাহিত্যকে আধ্যাত্মিক ও আবেগময় করিয়া তুলিয়াছে, ধর্ম্মকে মানবের উপকার ও লোকহিতকর ব্রতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এবং মানবের সাধারণ চিন্তাপ্রণালীকে এক অপূর্ব্ব সাহস ও বিচিত্র শক্তি প্রদান করিয়া বিবিধ বিজ্ঞানের পুষ্টি সাধন করিয়াছে।

ইতিহাসের উপদেশ

সুতরাং প্রাণ-বিজ্ঞানমূলক ইতিহাস-বিজ্ঞানের প্রধান শিক্ষা এই যে, কোন জাতির কোন ঘটনাই সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত নহে। সাহিত্যালোচনা, বিজ্ঞানচর্চ্চা, রাষ্ট্রীয় আন্দোলন, স্বাধীনতালাভ, দেশজয়—সকলই বিভিন্ন জাতির সর্ব্ববিধ আন্দোলনের অধীন। জাতীয় আকৃতি ও প্রকৃতিগুলি পরস্পর সংগ্রাম ও সংঘর্ষণে পরিপুষ্ট হয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই সংগ্রাম ও সংঘর্ষণ বিভিন্ন কালে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। এই জন্য বিভিন্নকালে মানবসমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বিভিন্ন সঙ্ঘ ও জাতির রূপ গ্রহণ করে।

তৃতীয়তঃ, কোন অভিব্যক্তির রূপ, আকৃতি ও প্রকৃতি স্থায়ী নহে—সকলই পরিবর্ত্তনশীল। বেষ্টনীর পরিবর্ত্তন অনুসরণ করিয়া মানব যতদিন বিভিন্ন আন্দোলনের সুযোগ সৃষ্টি করিতে পারিবে, ততদিন মানবের নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই। ধর্ম্ম ও সাহিত্যের আন্দোলনেও জীবনের বিকাশ হইয়া থাকে।

বীরপুরুষ

কিন্তু মানবের সহিত অন্যান্য জীবের একটা বিশেষ প্রভেদ আছে। বেষ্টনীর প্রভাবে সকল জীবই গঠিত হয়

এবং জীব বেষ্টনীকে ব্যবহার করিয়া পরিপুষ্ট হয় বটে, কিন্তু একমাত্র মানবই নিজের বেষ্টনী নিজে সৃষ্টি করিয়া লইয়া নিজের ইচ্ছা-মত বিকাশ সাধনের আয়োজন করিতে পারে। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক শক্তিগুলিকে নিজের অনুকূল করিয়া লইয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য-বিধানের শক্তি একমাত্র মানবেরই আছে। মানব চেষ্টা করিয়া অনায়ত্তকে আয়ত্ত করিতে পারে, প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে পদানত করিয়া নিজের আধিপত্য-বিস্তার করিতে পারে, দেশ ও কালকে খর্ব্ব করিয়া নিজের প্রয়োজন মত ব্যবহারোপ-যোগী করিয়া লইতে পারে; সমাজকে অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে উন্নীত করিয়া নূতন ভাব—নূতন ধর্ম্মপ্রচারের দ্বারা অঘটন ঘটাইতে পারে।

বিশ্বে নূতন অবস্থা ও সুযোগ সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য

মানবের জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি অসাধ্য সাধন করিয়াছে। অধ্যবসায় ও স্বার্থত্যাগের দ্বারা অনুপযুক্তকে উপযুক্ত করিয়া তোলা হইয়াছে। ইংলণ্ডের আল্‌ফ্রেড্, ফ্লোরেন্সের লোরেঞ্জো, ফ্রান্সের নরপতিগণ, বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রচারকেরা, রোমান-ক্যাথলিক জেসুট সম্প্রদায়, প্রসিয়ার ফ্রেডরিক, রুষিয়ার পিটার ও ক্যাথেরিণ এইরূপে মানবসমাজের বিভিন্ন জাতির মধ্যে

এই সামর্থ্যের পরিচয়

বিভিন্ন কালে নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিয়া মানবকে নূতন নূতন কর্ত্তব্যের অধিকারী করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়ই মানবের অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্যমের ফলে নূতন অবস্থায় আনীত হইয়া নবযুগের অভিনব বেষ্টনী সৃষ্টি করিয়াছে এবং মানবজাতিকে নূতন সমস্যায় নিক্ষিপ্ত করিয়া নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছে।

যুগান্তর-সৃষ্টি মানবশক্তির অধীন

সুতরাং কোন্ সময়ে কোন্ জাতি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া জগতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিবে, অথবা পৃথিবীর কোন্ উদ্দেশ্য কোন্ রাষ্ট্রবিপ্লবে বা ধর্ম্মপ্রচারে সিদ্ধিলাভ করিবে, তাহা কেবলমাত্র বেষ্টনীর শক্তিসমুচ্চয়ের উপর নির্ভর করে না। পারিপার্শ্বিক ভাব ও শক্তিসমূহই এবং জাতিগুলির পরস্পর সংঘর্ষণই প্রত্যেক জাতির চরিত্র গঠন করিয়া দেয় বটে, কিন্তু এই সংঘর্ষণ ও সংগ্রামের স্বাভাবিক ফলগুলিকে পরিচালিত করিবার সামর্থ্য ও যোগ্যতাই যুগোপযোগী বিপ্লব ও অবস্থা-সংঘটনের কারণ।

কেন একই সময়ে এক সমাজের উন্নতি, অপর সমাজের অবনতি, একস্থানে শিল্পনাশ, অন্যস্থানে ধর্ম্মপ্রচার, এক দেশের রাজ্যলাভ, অন্য দেশের সাহিত্যপ্রতিষ্ঠা,

এবং কেন বিভিন্ন কালে একই জাতির বিভিন্ন আচরণ ও আন্দোলন সংঘটিত হয়, তাহার জন্য এইরূপ ক্রিয়াশীল শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ই দায়ী। পারিপার্শ্বিকের ব্যবহার করিয়াই মানব ক্রমশঃ বৈচিত্র্য ও বিকাশ লাভ করিয়াছে; কিন্তু কোন সময়ে ভারত, মিশর, গ্রীস, কোন সময়ে রোম, কখনও মুসলমান, কখনও স্পেন উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এই জন্যই ফ্রান্স, ইংলণ্ড, রুষিয়া ও জর্ম্মাণি বিভিন্ন অবস্থায় ইউরোপের রাষ্ট্রীয় জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সময়োপযোগী সমস্যার মীমাংসা করিয়াছে। এই জন্যই বহুবার জর্ম্মাণি ও ইটালির স্বাধীনতা ও ঐক্যের চেষ্টা বিফল হইয়াছে। এজন্যই কখনও নাস্তিকতা, কখনও একেশ্বরবাদ, কোথাও খ্রীষ্টধর্ম্ম, কোথাও ইস্‌লাম, কোথাও সাম্রাজ্যনীতি, কোথাও ব্যবসায়নীতি, কখনও প্রজাতন্ত্র, কখনও রাজতন্ত্র মানবের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে।

বিচিত্র জাতীয় অবস্থার জন্য মানবের দায়িত্ব

মানবের ভবিষ্যৎ

ফলতঃ, কোন্ চিন্তা, কোন্ আদর্শ জগতে কখন প্রভাবান্বিত হইবে তাহা আকস্মিক বা দৈবঘটনার উপর

নির্ভর করে না। মানবের পুরুষকারই এই ঘটনাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া বেষ্টনী সৃষ্টি করিতেছে। প্রতিমুহূর্ত্তেই মানব পুরাতনের প্রয়োগ করিয়া নূতনের উদ্ভাবন করিতেছে, এবং পারিপার্শ্বিক শক্তিগুলি আয়ত্ত করিয়া ইহাদেরই সাহায্যে ইতিহাসের নূতন অধ্যায়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবার ব্যবস্থা করিতেছে।

পৃথিবীকে ব্যবহার করিবার ক্ষমতাই নবযুগের সৃষ্টি করিবে

মানবসমাজের চিন্তা ও কর্ম্ম-শক্তিগুলি যেরূপ ভাবে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে তাহার পরিবর্ত্তন বিধান করিয়া বর্ত্তমান যুগের কোন্ 'বর্ব্বর জাতি' জগতের ভারকেন্দ্র নূতন স্থানে সন্নিবেশিত করিবার সূচনা করিতেছে এবং এই আন্দোলনের ফলে যে নূতন শক্তির সমাবেশ হইবে তাহা ব্যবহার করিবার জন্য কোন্ সমাজের কোন্ মহাবীর প্রস্তুত হইতেছেন তাহাই এখন মানবজাতির ভাবিবার বিষয় হইয়াছে। জগতের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের মধ্যে যে ব্যক্তি সুযোগসমূহ ব্যবহার করিয়া অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, এবং পারিপার্শ্বিকের অনুবর্ত্তন করিয়া নূতন বেষ্টনী সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবেন, সেই প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষই ভবিষ্যৎ মানবসমাজের অগ্রদূত।

যতদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর ভাব ও শক্তিসমূহ নিজের প্রয়োজন মত প্রয়োগ করিয়া নূতন অবস্থা সংঘটনের সূত্রপাত করিবার উপযুক্ত একজন মাত্র ব্যক্তি থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত মানব-সমাজ যুগে যুগে দেশে দেশে বিচিত্র অবস্থায় বিচিত্র তথ্যের আলোচনা ও বিচিত্র আন্দোলনের পুষ্টিসাধন করিয়া বিচিত্র সত্যের আবিষ্কার করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত মানবজাতির আশা অটুট থাকিবে।

আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ায় সমৃদ্ধির যুগ

দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের উত্তরাধিকারিগণ এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন প্রদেশসমূহ করতলগত করিয়া সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন-মন্দির-স্বরূপ বিবিধ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। সভ্যতা-বিস্তারের এই সমুদয় কেন্দ্র মানবসমাজকে গ্রীক্‌সভ্যতার দ্বারা রঞ্জিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। সেই জগৎবিস্তৃত গ্রীক্‌-সভ্যতার আধিপত্যকালে চিন্তা ও শিক্ষাপদ্ধতির বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। এই নিবন্ধে তাহার চিত্র প্রদত্ত হইতেছে।

নূতন নূতন শক্তিসমূহের সংস্পর্শে ও নূতন নূতন ঘটনাবলীর প্রভাবে গ্রীক্‌-সভ্যতা নূতন রূপ ধারণ করে, এবং ইহার কেন্দ্র প্রাচীন গ্রীস পরিত্যাগ করিয়া এসিয়া ও আফ্রিকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নব্য গ্রীক্‌সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ

অধিকন্তু, অল্পকালের মধ্যেই রোমান সাম্রাজ্য ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের প্রদেশসমূহ গ্রাস করিয়া গ্রীক্‌-সভ্যতা বিস্তারের দায়িত্বগ্রহণ এবং রোমীয় প্রণালীতে গ্রীক্‌-সভ্যতার রোমীয়

সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিল। সুতরাং খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর আরম্ভ হইতে রোমীয় সভ্যতার অবসাদকাল পর্য্যন্ত গ্রীক্-সভ্যতা নিজের পবিত্রতা ও স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ম্যাসিডনীয় ও রোমীয় রূপ ধারণ করিয়াছিল। এই ম্যাসিডনীয় গ্রীক্সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র নীলনদ-তটবর্ত্তী আলেকজান্দ্রিয়া নগর, এবং রোমীয় গ্রীক্-সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র নগর-সাম্রাজ্ঞী রোম। এইরূপ অবস্থা-বিপর্য্যয়ের নিমিত্ত প্রাচীন গ্রীসের এথেন্সনগরও ম্যাসিডনীয় এবং রোমীয়ভাব ধারণ করিয়াছিল।

গ্রীক্সভ্যতার নবযুগ (১) ক্ষুদ্রনগরগত জীবনের পরিবর্ত্তে রাজতন্ত্র সভ্যতার প্রবর্ত্তন

নবভাবাপন্ন এথেন্স, নবপ্রতিষ্ঠিত আলেক্জাণ্ড্রিয়া অথবা গ্রীক্ভাবাপন্ন রোম কোন কেন্দ্রই প্রকৃত প্রাচীন গ্রীসের নিদর্শন নহে, সুতরাং গ্রীসের জাতীয় সভ্যতার ইতিহাসে ইহাদের কোনও স্থান নাই।

এই নবযুগে গ্রীক্দিগের স্বাধীনতা নষ্ট হইল। নব-প্রবর্ত্তিত বিজাতীয় রাজতন্ত্রের অধীনতায় তাহাদের স্বাভাবিক জাতীয় জীবনের গতি রোধ হইতে লাগিল। পুরাতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাজ্যসমূহের পরিবর্ত্তে নূতন নূতন শাসনপ্রণালীবিশিষ্ট বিভিন্ন প্রদেশ-রাজ্য, সাম্রাজ্য, যুক্ত-রাজ্যসমূহ প্রাচীন জাতীয় ভাবের বিনাশসাধন

করিয়া অভিনব জাতীয়তা ও নূতন রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রবর্ত্তন করিল।

ক্রমশঃ সমাজে বিশ্বজনীনতার প্রবেশ

রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন দেশবাসীদিগের আবাসভূমি হইয়া পড়িতেছিল। নিজ নিজ পল্লী, জনপদ বা নগরের চতুঃসীমায় আবদ্ধ না থাকিয়া লোকেরা নূতন নূতন দেশ ভ্রমণ দ্বারা নূতন নূতন আচার-ব্যবহার ও নূতন-নূতন সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া প্রশস্তমনা ও উদার-চেতা হইতে লাগিল। বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসি-বৃন্দ ও রাজন্যবর্গের বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে সখ্য, ঐক্য ও সহানুভূতি বর্দ্ধিত করিতেছিল।

বিচারালয়ে ও রাজদরবারে সর্ব্বত্র গ্রীকভাষা প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। এই উপায়ে বহুদেশে এক ভাষার প্রচলন হইয়াছিল। শিক্ষা ও বাণিজ্যবিস্তারের ফলে ভাব ও কর্ম্মের আদান-প্রদানের সহায়তা-বিধানোপযোগী নূতন নূতন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই রূপে নানা উপায়ে ব্যাপকতা ও বিশ্বজনীনতার পুষ্টি সাধিত হইতেছিল।

এইরূপ অবস্থাপরিবর্ত্তনের নিমিত্ত তাহাদের চিন্তা-

জগতেও যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। স্বরাজ্যের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে ব্যক্তিত্ববিকাশ ও জীবন গঠনের সুযোগসমূহ নষ্ট হওয়ায় তাহাদের চিন্তা ও কর্ম্ম রাষ্ট্রীয় জীবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং নৈতিক জগতের ভারকেন্দ্র স্থানভ্রষ্ট হইয়া জীবনের নূতন আদর্শ, ভাব ও কর্ম্মের নূতন লক্ষ্য, সমাজের নূতন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছিল।

(২) পুরাতন রাষ্ট্রগত সভ্যতার বিলোপের ফলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিকাশ

কর্ম্মী, উৎসাহী এবং সামরিক শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা স্বদেশে উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র না পাইয়া দূর বিদেশে গমনপূর্ব্বক স্বকীয় প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির বিকাশ-সাধনোপযোগী জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। ধীশক্তি-সম্পন্ন পণ্ডিতগণ রাজবিচারালয়, মন্ত্রণাসভা প্রভৃতি সামাজিক কর্ম্মক্ষেত্রসমূহ ত্যাগ করিয়া নিভৃত স্থানে শিষ্যপরিবৃত হইয়া নিজ নিজ শক্তি-অনুসারে বিদ্যালয় ও আলোচনা-সঙ্ঘ প্রভৃতি চিন্তার কেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন।

সুতরাং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা স্থির-প্রতিষ্ঠিত হইল। যে স্বাধীনচিন্তা বহুদিন হইতে গ্রাক্‌সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা নূতন ঘটনাবলীর

প্রাচুর্ভাবে স্বাভাবিকরূপেই অবারিতভাবে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। জেনো ও এপিকুরাস এবং তাঁহাদের মতাবলম্বী সম্প্রদায়েরা, রাষ্ট্রীয় জীবনের পুষ্টিতে ব্যক্তির সম্পূর্ণতা লাভ হয়,—এই প্রাচীন মতবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়া রাষ্ট্র ও সমাজ-বিচ্যুত পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের আদর্শ ও উপায় সম্বন্ধে মতপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

গ্রীক্‌জীবন এইরূপে ব্যাপকতা ও বিশ্বজনীনতা, এবং ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া সাহিত্য, কলা, রীতিনীতি প্রভৃতি সভ্যতার বিবিধ অঙ্গের রূপান্তর সৃষ্টি করিল।

(৩) সঙ্কলন, অনুবাদ, সমালোচনা ও তুলনা-সিদ্ধ বিজ্ঞানের যুগ

সাহিত্যসেবী এবং বিদ্যানুরাগী নরপতিরা জ্ঞানানুশীলন ও বিদ্যাচর্চ্চার জন্য গৃহ-প্রতিষ্ঠা, ভূসম্পত্তি-দান, অর্থ-সাহায্য প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে পণ্ডিতদিগের কার্য্যের সহায় হইয়া পণ্ডিত-সম্মিলনী, সমালোচনাসমিতি, সাহিত্যপরিষৎ, মিউজিয়াম, পুস্তকাগার, বিজ্ঞান-মন্দির প্রভৃতি বিদ্বৎসঙ্ঘ গঠনের সুবিধা করিয়া দিলেন। গ্রীক্, মিশরীয়, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদসমূহের সংঘর্ষণে চিন্তাপ্রণালীর নূতন সংঘটনের সুবিধা ঘটিল।

প্রাকৃতিক ও মানবীয় উভয় জগতের বিচিত্র ঘটনাবলী ও কার্য্যসমূহের বিবরণ প্রস্তুত হইতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বিচিত্র পদার্থ ও দ্রব্যসমূহ বিদ্বৎসমিতিতে আনীত হইয়া আলোচিত হইতে লাগিল।

বিবিধ অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহের ভাব সুধীমণ্ডলীতে প্রচারের দ্বারা বিবিদিষা বর্দ্ধিত করিল। নানাদিকে নানাবিষয় লইয়া চিন্তা, গবেষণা, আলোচনা, তর্ক, বাদানুবাদ, ব্যাখ্যা প্রভৃতি কার্য্য চলিতে লাগিল। শিষ্যেরা গুরুদিগের মতবাদ-সমূহের টীকাটিপ্পনী লিখিতে লাগিলেন।

বিচিত্র তথ্যসংগ্রহের ফলে তুলনা ও শ্রেণীবিভাগ-প্রণালী অবলম্বনের সুযোগ উপস্থিত হইল। উদ্ভিদ্, প্রাণী, ভাষা প্রভৃতি সকল পদার্থেরই নিয়মসমূহ ক্রমান্বয়, পারম্পর্য্য, এবং কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। পরস্পরের তুলনা এবং তারতম্যের ফলে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ এবং চিন্তা-প্রণালীসমূহের স্থান, ক্রম ও পর্য্যায় নির্ণীত হইতে লাগিল। মতসমূহ শ্রেণীবদ্ধ এবং শৃঙ্খলীকৃত হইয়া প্রকৃত বিজ্ঞানের রূপ ধারণ করিল।

বাস্তবিক পক্ষে এক বৈজ্ঞানিক যুগ উপস্থিত

হইয়াছিল। গণিত, জ্যোতিষ, জ্যামিতি, ভূগোল, ইতিবৃত্ত প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হইল। এই তর্ক এবং যুক্তিমূলক সমালোচনার যুগে ধর্ম্মতত্ত্ব এবং সাহিত্যও তুলনা-সিদ্ধ বিজ্ঞান হইয়া পড়িল। লোকে মৌলিক কাব্যাদির রচনা পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কলন, অনুবাদ, ও সমালোচনা প্রভৃতি দ্বারা গদ্য-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন, এবং বিদ্যাবিস্তারের জন্য অল্প মূল্যে পুস্তক প্রকাশ করিতে লাগিল। লিখন-প্রণালী এবং রচনাকৌশলের অপেক্ষা সরল ও সুবোধ্য ভাষায় ভাব-প্রকাশের প্রতি লোকের দৃষ্টিপাত হইল। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বাগ্মিতা শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক অনুসন্ধান, দার্শনিক বিশ্লেষণ এবং ঐতিহাসিক গবেষণা ও ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি গম্ভীর বিষয়ে মন নিবিষ্ট করিলেন।

নব্যশিক্ষাপদ্ধতি
(১) শারীরিক শিক্ষার লোপ
(২) রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার লোপ

সুতরাং এই যুগের শিক্ষাপদ্ধতি ও পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের শিক্ষাপদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল। শারীরিক এবং মানসিক শিক্ষা ক্রমশঃ অবনত ও লুপ্ত প্রায় হইয়া মানসিক শিক্ষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিল। সমাজের প্রথম যুগ হইতে মানসিক ও শারীরিক

উৎকর্ষের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের যে প্রয়াস ছিল, এতদিনে তাহা বিফল হইল। অধিকন্তু রাষ্ট্রীয় নৈতিক বাগ্মিতা ও সমালোচনা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে সৃষ্টি, স্থিতি, জীব, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন প্রভৃতি চিন্তাজগতের গভীর বিষয়গুলি মানসিক শিক্ষার বিষয় হইল।

(৩) সরকার-পরিচালিত বিশ্ব-বিদ্যালয়

ক্রমশঃ বিদ্যালয়সমূহ সরকারের ব্যয়ে ও সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতে লাগিল। রাজশক্তির প্রভাবে আলেকজেন্দ্রিয়া পুরাতন এথেন্সকে হতপ্রভ ও হীনবীর্য্য করিল। রোমনগরী সাম্রাজ্য-নীতি দ্বারা বিজিত প্রদেশ-সমূহের কীর্ত্তিকলাপ ধ্বংস করিয়া গ্রীক্‌সভ্যতার সাহায্যে নিজের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিবার জন্য আপনাকে গ্রীক্‌সভ্যতার রাজধানী ও প্রধান কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

(৪) প্রাচীন গ্রীসের বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহ হতপ্রভ ও লুপ্তকীর্ত্তি

এই যুগে এথেন্‌স চিন্তাজগতে যে সামান্য প্রতিপত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা আলেক-জেন্দ্রিয়ার নব্য চিন্তাপদ্ধতির অনু-করণের ফল মাত্র—স্বকীয় বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে। বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে কেবল মাত্র ষ্টেট-পরিচালিত প্রাদেশিক বিশ্ব-

বিদ্যালয়রূপে সম্রাট্দিগের বদান্যতায় নির্ভর করিয়া এথেন্সের শেষ জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। এইরূপে প্রাচীন গ্রীক্-সভ্যতা প্রথমতঃ স্বকীয় বিশেষত্ব এবং দ্বিতীয়তঃ নিজ বাসভূমি হারাইয়া সম্পূর্ণ নূতন সভ্যতা সৃষ্টির উপকরণ হইল।

ইউরোপ ও ভারত

প্রত্যেক জাতির ও সমাজের ক্রমবিকাশের ভিন্ন ভিন্ন পন্থা আছে। সেই সেই নিয়ম মানিয়া লইতেই হইবে। সকল সমাজের প্রকৃতি এক নয়—এজন্য সকলের ব্যবস্থাও এক নয়। এক সমাজের নিয়ম আর এক সমাজের পক্ষে হানিকরও হইতে পারে। যার যেখানে প্রাণ সেখানটা খুঁজিয়া বাহির করিয়া কাজ করা উচিত। স্বাতন্ত্র্য কোথায়,—কোন্ বিষয়ে কোন্ কাজে লুকাইয়া আছে, এই বিষয় ঠিক না করিতে পারিলে সকল শ্রমই পণ্ড হইয়া যায়। আমড়া গাছে আমের জন্য উৎসুক হইয়া থাকিলে যেরূপ হয়—প্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তি ও সমাজের কাছে নিবৃত্তির নিদর্শন আশা করিলে সেইরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। তাই "ইউরোপ এ অবস্থায় এই কাজ করিয়াছিল, আমরাও তাই করি"—একথা না ভাবিয়া আমাদের এই এত হাজার বছরের জাতি কি ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে ইহার প্রকৃতির বিকৃতি ঘটিয়াছে, এই সব অনুসন্ধান করিয়া "আমরা

জাতীয় বিশেষত্ব

আমাদের উপযোগী, আমাদের চরম উন্নতির জন্য কি করিতে পারি” এরূপ চিন্তার স্রোত প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক।

ইউরোপ ও ভারত দুই ঠিক এক পথের পথিকও নয়, গন্তব্য স্থানও এক নয়। সেজন্য সকল বিষয়ে অনুকরণ করিলে সুফলের আশা করা যায় না।

ইউরোপীয় সভ্যতার মূলমন্ত্র

ইউরোপের মন প্রাণ বাহ্য বস্তুর দিকে। ইহার সভ্যতা ও আদর্শ স্থূল জগতের অকিঞ্চিৎকর পদার্থের সহিত জড়িত। অর্থ ইহার মূলে—সংসারের পার্থিব উন্নতিই চরম লক্ষ্য। এজন্য প্রতিযোগিতা, জীবন-সংগ্রামের প্রকোপ এত বেশী এবং শিল্পবাণিজ্য কল-কারখানার এত সমাদর। তাই জড়-বিজ্ঞান ইউরোপে এত উন্নত।

আর টাকা কড়ির ঝন্‌ঝনানি বড় বেশী,—পৃথিবীর জিনিষের প্রতি এত আসক্তি বলিয়া হৃদয়ের কোমল-ভাব একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাথা খাটাইয়া এক public spiritএর আবির্ভাব করা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের গন্ধ মাত্র থাকে না। স্বদেশ-হিতৈষিতা তাঁহাদের কাছে মাতৃপ্রেম নয়, মনোবিজ্ঞানের সৃষ্ট একটা নীরস ধারণা মাত্র।

আর এজন্যই ইউরোপীয় সমাজে প্রকৃত সাম্য নাই। একদিকে যেমন ধনাঢ্য লক্ষপতি, অপরদিকে অসংখ্য ধনহীন পরিশ্রমজীবী। আবার, বিজ্ঞান ইউরোপকে বাহ্য জগতের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা করিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ নিজেও বাহ্যজগতের ক্রীতদাস হইয়া পড়িয়াছে। তড়িতের শক্তি, বাষ্পের শক্তি সঞ্চালন করিয়া উহারা দেশ-কালকে একেবারে খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহাদেরই বশে থাকায় পরমাত্মার বিষয় ভাবনা তাঁহাদের একেবারে লোপ পাইয়াছে। "আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তির" চেষ্টা তাঁহাদের কাছে পাগ্‌লামি বলিয়া বোধ হয়।

ভারতবর্ষের সভ্যতা ও আদর্শ ঠিক বিপরীত। সাহিত্য, শিল্প, সমাজ, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সকল বিষয়েই এখানে এক ভিন্ন ভাবের চিহ্ন পাওয়া যায়। "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং" এবং আত্মবশতাই যে সুখ এ ভাব ভারতবাসীর মজ্জাগত। এজন্য বাহিরের জিনিষের প্রতি মন যাহাতে আকৃষ্ট ও আসক্ত না হয়, হিন্দুসমাজ সর্ব্বদা এই চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছেন। ধর্ম্মই এ সভ্যতার মূলে। এখানে ইউরোপের প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হয় না—সহানুভূতি, প্রেম,

ভারতবর্ষের জাতীয়তা

স্বার্থত্যাগ ও একান্নবর্ত্তিতাই এদেশের প্রথা। ব্যবসায় বাণিজ্যেও তাই। এজন্য অর্থের প্রতি এত অনাদর বলিয়া, বাহ্যবস্তুর প্রতি আসক্তি কম বলিয়াই জড়বিজ্ঞানের উন্নতি হয় নাই এবং রেলগাড়ী ও টেলিগ্রাফ্ আবিষ্কারের প্রয়োজন বোধ হয় নাই।

এই দুই ভিন্ন পথের পথিকের সম্মিলনে এক ঘোরতর বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। সেই বিপ্লব আমাদের দেশে এখন চলিতেছে। ইহার ফলে এই হইবে যে, ত্যাগপথাবলম্বী ভারতসমাজ ভোগী ইউরোপের জলে ধৌত হইয়া নূতন উদ্যমে ত্যাগের নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিবে। এই সমাজের বিশেষত্ব যে ধর্ম্মভাব তাহা কখনই লুপ্ত হইবার নহে, তবে এই বিংশ শতাব্দীর নূতন ভাবের সংঘর্ষণে যাহাতে বিপর্য্যস্ত না হইয়া বরং দৃঢ় এবং বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী ভাবে স্বীয় গন্তব্য স্থানে যাইতে পারে, এজন্য ইউরোপের ভারতে আসিবার প্রয়োজন ছিল। ইউরোপ তাহার কর্ত্তব্য করিয়াছে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন

ভারতবর্ষও ইউরোপের ডাকে সাড়া দিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর নূতন ভাব ও শক্তি-সমষ্টি ব্যবহার করিবার জন্য ভারতবাসিগণ চিন্তা ও কর্ম্মক্ষেত্রে আন্দোলন আরম্ভ

করিয়াছেন। শিল্পে, সাহিত্যে ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদগুলি সুবিস্তৃত সমাজের সমগ্রতা ও ঐক্যের উপলব্ধি করিতেছে। ইহাতে প্রাচীন পল্লীগত জীবনের পরিবর্ত্তে অভিনব জাতীয় জীবনের বিকাশ হইতেছে।

বর্ত্তমান ভারতে ইউরোপের দান

আমরা ক্রমশঃ এই যে বিচিত্র ঐক্যের সন্ধান পাইতেছি, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে একেবারে নূতন জিনিষ। ধর্ম্মে, সমাজে, আচার-ব্যবহারে আমাদের অনৈক্য ও বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্যের কোন দিনই অভাব ছিল না। কিন্তু পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষার প্রভাবে আমরা ক্রমশঃ যে অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা রাষ্ট্রীয় জীবনের ঐক্য—একরাষ্ট্রীয়তা।

(১) এক-রাষ্ট্রীয়তা

ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা আমাদের স্বকীয় সভ্যতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। ইংরাজ জাতি আমাদের ভারতবর্ষ গঠন করিয়াছেন—সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ভারতবাসীর স্থান খুঁজিয়া লইবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।

(২) জাতীয় আত্ম-প্রতিষ্ঠা

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপীয়েরা যখন

ব্যবসায়-নীতির বশবর্ত্তী হইয়া ভারতবর্ষে আগমনের পথ আবিষ্কার করে, তখন তাহাদের এই কার্য্য একটী ভৌগোলিক আবিষ্ক্রিয়ামাত্র রূপে বিবেচিত হইত। তাহার পর সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ-রাজ্য লইয়া যখন ইউরোপে রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তাহাতে ভারতবর্ষ আসিয়া ক্রমশঃ ইউরোপীয় জীবনসংগ্রামের আবর্ত্তে পতিত হইল। তাহার ফলে, এক বিচিত্র রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার সংঘটন—ইংলণ্ডের ভারতসাম্রাজ্য ও ভারতবাসীর অধীনতা।

ঐতিহাসিক ভাবে আলোচনা করিলে, এই অধীনতাই সম্পূর্ণরূপে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার বিষয়। কারণ এইরূপে পরের বশে থাকিয়াই ভারতবর্ষ নিজের আত্মাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছে। আজ দেখিতে পাইতেছি, সুদূর অতীতের আকস্মিক এক ভৌগোলিক আবিষ্করণ মানবসমাজের এক বিচিত্র জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সূচনামাত্র।

গভীর ভাবে এবং দূরদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমাদের সমাজে কোন অনিষ্টই সাধিত হয় নাই। বরং যাহা কিছু আজকাল আমরা আমাদের অভিনব জাতীয়তার গৌরবের সামগ্রী, আমাদের শ্রদ্ধা ও

ভক্তির বিষয় বিবেচনা করি, সমস্তই আমরা ইউরোপের সহিত সংঘর্ষণে লাভ করিয়াছি।

ইংরাজী শিক্ষা আমাদের দেশে যে উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকুক এবং আমাদের সমাজ পাশ্চাত্য-সভ্যতাকে প্রথমে যেরূপ ভাবেই গ্রহণ করুক না কেন,—যখন হইতে আমরা কতকটা স্বাধীনতার সহিত বিজ্ঞান, স্বায়ত্ত-শাসন, রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রভৃতি বিষয়ক বিদেশীয় ভাবগুলিকে স্বকীয় জাতীয় বিশেষত্বের অঙ্গীভূত করিতে কিয়ৎ-পরিমাণে উপযুক্ত হইয়াছি, তখন হইতেই আমাদের বিচিত্র সমাজ সকল বিষয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। আমরা একে একে স্বাধীন ভাবে জাতীয় মহাসমিতি, কংগ্রেস, সাহিত্যপরিষৎ, শিক্ষাপরিষৎ, বিজ্ঞানপরিষৎ, বিদেশ-প্রেরণ-পরিষৎ প্রভৃতি বিচিত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে উপযোগিতা লাভ করিয়াছি। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম, আমাদের চিন্তা ও কর্ম্মের আন্দোলনে তরঙ্গায়িত হইতেছে। সকল দিকে আমাদের স্বতন্ত্র জীবনীশক্তি বিকাশ লাভ করিতেছে।

(৩) কর্ম্ম ও চিন্তার দ্বিবিধ কেন্দ্র

এমন কি, সম্প্রতি আমাদের সমাজে ত্যাগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, পরোপকার, মানবসেবা, লোকহিতৈষণা, প্রভৃতি

আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সত্যগুলিকে জীবনে উপলব্ধি করিবার যে সকল প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাও প্রকৃত প্রস্তাবে পাশ্চাত্যশিক্ষা-প্রসূত। আমাদের প্রাচীন উপনিষদ্ ও বেদান্তের উপদেশ আমরা নূতনভাবে ইউরোপের নিকট প্রাপ্ত হইয়া গীতা-প্রচারে, দর্শনালোচনায় এবং নিষ্কাম কর্ম্মে জীবন উৎসর্গীকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের আধুনিক সন্ন্যাসী ও কর্ম্মযোগিগণ গেটে, কার্লাইল, এমার্সন, রাস্কিন্, টলষ্টয় প্রভৃতি ইউরোপীয় ঋষিগণের শিষ্য।

(৪) ভাবুকতার প্রবর্ত্তন

ফরাসীবিপ্লবের সময় হইতে ইউরোপ নানা কারণে বহু ঘাতপ্রতিঘাতের পরে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীন চিন্তা, ব্যক্তিত্ব-বিকাশ, আত্মার পরিপূর্ণতা, নিম্ন-জাতির অধিকার, ডিমক্রেসি, সোশ্যালিজ্ম্ প্রভৃতি সম্যক্ অবধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার ফলে ইউরোপের সাহিত্যক্ষেত্রে, ব্যবসায়ে, ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবনে যে ব্যাপক ও সর্ব্বতোমুখী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার প্রভাবে সমাজে ভাবুকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং অতি-প্রাকৃত ও অতি-মানবীয় ভাব প্রবিষ্ট হইয়া ইউরোপে এক "অফ ক্লেরাঙ্গ" বা নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। ইউ-

রোপের এই "রোমাণ্টিক্" আধ্যাত্মিক বিপ্লবই আমাদের আধুনিক বৈদান্তিক আন্দোলনের মূল প্রস্রবণ।

ভারতবর্ষ ইউরোপের নিকট ঋণী—একথা স্বীকার করিলে ভারতবর্ষের কোন গৌরবহানির আশঙ্কা নাই। মানবজাতির সভ্যতা এইরূপ পরস্পর আদান-প্রদানেই পরিপুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে কতকগুলি সত্য আবিষ্কার করিয়া মানবের সভ্যতাভাণ্ডারে দান করিয়াছিল। আজ কাল কতকগুলি নূতন সত্যের উপহার লইয়া আধুনিক ইউরোপ মানবজাতির দ্বারে দণ্ডায়মান। মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, গ্রীক প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচীন সমাজ নিজ নিজ দাতব্য দান করিতে করিতেই অতীতের গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। তাহারা স্বতন্ত্র উপায়ে এই আধুনিক সভ্যতা গ্রহণ করিয়া নূতন সত্য দান করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারত এক বিচিত্র অমরতা লাভ করিয়া আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আধুনিক সত্যগুলিকে নিজ বিশেষত্বের দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়া মানবজাতির ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত করিবার আয়োজন করিতেছে।

আধুনিক গ্রীস, আধুনিক মিশর প্রাচীন জীবনের কোন সাক্ষ্যই বহন করে না, কিন্তু আধুনিক ভারত

ইউরোপীয় জলে ধৌত হইয়াও প্রাচীনের পারম্পর্য্য রক্ষা করিতেছে। ভারতবর্ষই যথার্থ ভাবে প্রাচীন ও নবীন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনস্থল। এই সঙ্গমক্ষেত্রে যে অপূর্ব্ব সমন্বয়ের সংঘটন হইতেছে তাহা কেবলমাত্র ইউরোপেরই অভিনয় বা প্রাচীন ভারতেরই পুনরাবৃত্তি নহে, ইহা নূতন মূর্ত্তিতে ভারতবর্ষের অভিনব শক্তির প্রকাশ—নবযুগোপযোগী নবরূপ-পরিগ্রহ।

নব্য ভারতের চিত্র

ভারতসমাজের প্রথম আবির্ভাব হইতে এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, যত দৃশ্যের অভিনয় হইয়াছে—ইহার বাণীকুঞ্জে যত পিকবর সুস্বরে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে—যত কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরের আবির্ভাব হইয়াছে—যত কাব্য, পুণ্য, মাহাত্ম্য, মহাপ্রাণতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে—যত ত্যাগ-বৈরাগ্য-নির্ব্বাণের কাহিনীতে পূর্ব্ব পুরুষদের চিত্ত উৎফুল্ল করিয়াছে—কঠোর কর্ত্তব্যময় সংসারজীবনের সহিত সন্ন্যাসের যত সমন্বয় হইয়াছে—বিশ্ব-সভ্যতার যত স্রোত আসিয়া ভারতীয় বিশেষ সভ্যতার কলেবর পুষ্ট করিয়াছে, এই নবযুগে সকলগুলি আধুনিক জগতের কর্ম্ম ও ভাবসমষ্টির সহিত এক

(১) বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যের সমন্বয়

অদ্ভুত মিলনসূত্রে গ্রথিত হইয়া—অব্যাহত গতিতে জাতীয় মোক্ষের পথে অগ্রসর হইতেছে।

আমাদের জাতীয় জীবনগঙ্গা হিমাদ্রি সদৃশ অটল সত্যের শৃঙ্গ হইতে বহির্গত হইয়া এতদিন বিশেষ একভাবে চলিয়া আসিতেছিল এবং বিশেষ এক উপায়ে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল দিয়া আসিতেছিল। সেই চতুর্ব্বর্গ লাভের উপায়—ভোগের পথে থাকিয়া কিরূপে ত্যাগের কাজ করা যায়, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সেই চেষ্টা।

এখন এই প্রয়াগ-ক্ষেত্রে নূতন এক স্রোতের সাক্ষাৎ হইল। পার্থিব জীবনেরও উন্নতি প্রয়োজন—অর্থ একেবারে অনর্থের মূল নহে—জড়বিজ্ঞানেরও আবশ্যকতা আছে—রাজনৈতিক বিষয়েও উন্নতির প্রয়োজন। বাহ্য জগতের প্রতি একেবারে অমনোযোগী হইলে চলিবে না। কেবল নিজের পল্লী বা পরগণার ভাবনা ভাবিলে এখন আর চলে না—স্বদেশ একটী বড় সমষ্টি, তার বিষয়েও সন্ধান লইতে হইবে, লইবার সুবিধাও আছে। ছাপাখানা, ডাকঘর, রেলগাড়ী, খবরের কাগজ এবং যাতায়াতের সুবিধায় ভাবের আদানপ্রদান এখন সুসাধ্য। ইউরোপীয় এই ভাব আসিয়া আজ কাল এখানে মিলিত হইল। এখন হইতে

দু'য়ে মিলিয়া মিশিয়া বিজ্ঞানকে ধর্ম্মের সহায় করিয়া সাগরগামিনী স্রোতোবহার মত দুকূলকে নূতন উপায়ে চতুর্ব্বর্গলাভের নূতন সুবিধা সৃষ্টি করিতে করিতে অনন্তের সঙ্গে মিলিতে চলিবে।

এখন হইতে আমাদের সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা চলিয়া গিয়া স্বাভাবিক ভাব হইবে। সমাজের প্রথম গঠনের সময়ে অধিকারিভেদানুসারে যে জাতিভেদের ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেই অধিকারিভেদের নিয়মই আজকালকার নূতন অবস্থানুসারে কিছু পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়া নূতন ধরণের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের অবতারণা করিবে। রেলগাড়ীতে চড়িলে ধর্ম্মের যে হানি আশঙ্কা করিয়া থাকি, তাহাও আর ভয় করিতে হইবে না। এখন বুঝিতে পারিব, যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নিষ্ঠুর উপদেশে আমাদের ধর্ম্মের বিপ্লব ঘটাইতে পারিবে না। বিজ্ঞানকে আমরা যতই নিজের করিয়া লইতে পারিব, ততই বেশ বুঝিব যে আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ অত্যুচ্চ বিজ্ঞানের নিয়মেই গঠিত। তার পর, দুর্ভিক্ষ অনাহারের প্রকোপ যখন কমিয়া আসিবে পরে একদিন এই ভারতের ধর্ম্মনেতারা দেশ হইতে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবেন এবং একে একে ইউরো-

(২) ইউরোপের মুক্তি সাধন

পের সকল দেশকে বৈরাগ্যের কথা শুনাইয়া মন প্রাণ কাড়িয়া লইবেন। ভারতের ধর্ম্ম-বিজ্ঞান ইউরোপের কর্ম্ম-বিজ্ঞানকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়া উহাদের জীবনসংগ্রাম ও সাংসারিকতার হ্রাস করিয়া দিবে। ইউরোপীয় সমাজ এখন বৈষয়িক ভারে জর্জ্জরিত, এই আধ্যাত্মিক নবজীবনের জন্য বসিয়া আছে। ভারতের প্রকৃত উন্নতিতেই ইউরোপের মুক্তি।

বিশ্বে আধ্যাত্মিকতার অভাব

পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল সমাজেই ভগবানে অবিশ্বাস, পার্থিব উন্নতি ও স্বার্থসিদ্ধির অভিলাষ, বাহ্য অনুষ্ঠানের আড়ম্বর, অর্থপৈশাচিকতা এবং পরস্পর প্রতিযোগিতা অত্যন্ত প্রবল হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য বিশ্ববিধাতার স্বাভাবিক নিয়মেই মনুষ্যসমাজের কর্ম্ম ও চিন্তাস্রোত বিপরীত-দিকে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিশ্বামিত্র যেমন বশিষ্ঠের সহিত সংগ্রামে হঠাৎ চৈতন্যলাভ করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন "ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মবলং পরং বলম্", সমস্ত পৃথিবীও সেইরূপ ভোগের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে করিতে এমন এক অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে এখন নিবৃত্তি ও ত্যাগের উপাসনায় রত না হইয়া থাকিতে পারিতেছে না। এখন "ধিগ্ বলং

সম্ভোগবলং ত্যাগবলং পরং বলম্” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় মনুষ্যসমাজ আধ্যাত্মিক নবজীবনে পদার্পণ করিতেছে।

এই বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক আন্দোলন ভারতবর্ষকেই নিজের কেন্দ্রস্থানরূপে বাছিয়া লইয়াছে। ইউরোপীয়

আধ্যাত্মিক আন্দোলনে ইউরোপ ও ভারত

সভ্যতা যীশু খ্রীষ্টের পরম ত্যাগ-ধর্ম্মকে ভোগ-ধর্ম্মে পরিণত করিয়াছে। ডিমক্রেসি, সোশ্যালিজম্ প্রভৃতি ঐক্য, সহানুভূতি, বৈদান্তিক সাম্য, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সর্ব্ববাধাহীন পরিপূর্ণতা বিধানের অনুষ্ঠানগুলি অনৈক্য, প্রতিযোগিতা, এবং যথেচ্ছাচারের উপায় হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপীয় জল হাওয়ায় সন্ন্যাস ও নিবৃত্তির অনুষ্ঠান জীবিত থাকিতে পারে না।

ভারতীয় প্রবৃত্তি ও সমাজ স্বভাবতঃ এবং চিরকালই ধর্ম্মমূলক। কিন্তু আত্মনির্ভরতার অভাবে সেই ভারতীয় সমাজ শীতসঙ্কুচিত কূর্ম্মের ন্যায় সকল প্রকার চিন্তা ও কর্ম্মে উদাসীন। এজন্য স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কর্ম্মের আন্দোলন এখানে প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

সুতরাং পৃথিবীর আধ্যাত্মিক আন্দোলন ভারতীয় রাজনৈতিক, এবং স্বাধীন শিক্ষাসম্বন্ধীয় আন্দোলনের

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে মানব-জাতির স্বার্থ

আকার ধারণ করিয়াছে। এখানকার জাতীয় আন্দোলনসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য সমস্ত বিশ্বজগতের মুক্তিসাধন।

ত্যাগই ধর্ম্মজীবনের প্রকৃত উপকরণ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান, এবং যে ত্যাগ ধর্ম্মের মূল তাহা দেশ, কাল ও সমাজের অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। অন্যান্য জিনিষের ন্যায় ধর্ম্মেরও ক্রম-বিকাশ হয়। ভারতের বর্ত্তমান যুগে ত্যাগধর্ম্ম দেশসেবারূপ ধারণ করিয়াছে।

দেশসেবাই ভারতবর্ষে নবযুগের নূতন ধর্ম্ম হইয়াছে। জাতীয় শিক্ষালয়, বিজ্ঞানাগার, সমবেত চিন্তা ও কর্ম্মের জন্য প্রকৃতিপুঞ্জের সম্মিলনগৃহ নূতন মন্দিররূপে মানব-চিত্তে ধর্ম্মভাব উদ্বুদ্ধ করিতেছে। জাতীয় কর্ম্মের জন্য বিলাসবর্জ্জন ও পরোপকার, বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস অবলম্বন নূতন অনুষ্ঠানের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে।

Opinions

1. MAHAMAHOPADHYAYA PANDIT **ADITYA-RAM BHATTACHARYYA,** M. A., Fellow, Allahabad University, Late Professor, Muir College, Allahabad, author of *Riju Vyakarana* :—

"I write this in my appreciation of your effort to facilitate and **popularise the study** of Sanskrit. Your method to teach sanskrit without the learner's going through a first course of grammar merits trial.

The old method has done its part so long and will remain inevitable in the case of higher and thorough study. But if **quicker methods** of acquiring languages, living or dead, be discovered and introduced, humanity will bless him whose inventive genius can succeed to achieve the object which every well-wisher of learning has at heart.

At the very outset the attempt looks somewhat revolutionary. But in other fields it is such **revolutionary departures** from the old track that has hastened the advance of arts and sciences."

2. RAIBAHADUR BABU **SRISH CHANDRA BASU,** B. A., *of the Provincial Civil Service, (U. P.),* author of the *Ashtadhyayi* of *Panini,* (M. A. Text-Book, London University) and Translator (and

annotator) of Bhattaji Dikshita's *Siddhanta Kaumudi*, the *Upanishads*, *Vedanta Sutra* and the *Mitakshara* in the 'Sacred Books of the Hindus Series' :—

"The scheme of Sanskrit works in Professor Benoy Kumar Sarkar's pedagogic series is based on the conception that any language, whether inflectional or analytical, living or dead, can be learnt exactly in the method in which the mother-tongue is acquired. No preliminary training in the generalisations and definitions of grammar is therefore required, and the student may be at once introduced to the *sentence* as the unit of thought and expression.

By a skilful and systematic application of this method, Professor Sarkar has been able to build up, through lessons and exercises in translation, conversation, questions and answers, and correction of errors, a text-book in Sanskrit which serves the *double purpose* of a guide to composition and a series of primers on Sanskrit literature. From this series of books the reader can master not only the necessary rules of Sanskrit Grammar, but also will be familiar with some of the most **important passages of standard classics** e.g. *Raghu-vansam*, *Kumar-sambhavam*, *Ramayanam* and *Manu Sanhita*, adaptations or originals of which the author has incorporated in

this book as specimens of narrative, historical, poetical and other styles.

In applying to the study of Sanskrit principles and methods that have been utilised in modern languages in Europe, Professor Sarkar has demonstrated, through practical illustrations, lesson by lesson, that the most highly inflectional languages may, with considerable economy of time and labour and other pedagogic advantages, be reduced to the same method of teaching and treatment, as those languages which are not bound hard and fast by Grammar. To all students of Sanskrit language and literature, Professor Sarkar's series cannot but be eminently useful and instructive; and scholars interested in the art of teaching and the history of Sanskrit learning cannot but note the **considerable improvement on the existing Readers and Primers** that are in most cases mere imitations or occasional modifications of the really original works of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagara, C. I. E.—whose genius succeeded in simplifying and adapting Panini for the use of students in Bengal.

The method of the pioneer of Sanskrit learning can no longer be profitably used under the altered conditions of the times; and it is desirable that the new method should have a **fair trial in our secondary schools** in the interest of educational reform."

৩। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই গ্রন্থ বিশেষ অবধানের সহিতই আলোচনার যোগ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। যাঁহারা শিক্ষাব্যবসায়ী তাঁহারা এই বই যত্ন করিয়া পড়িবেন ও উপকারলাভ করিবেন, এইরূপ আশা করি। বিনয়বাবু যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বিপুলবিস্তৃত ও দুঃসাধ্য। ইহা সম্পন্ন করিয়া তিনি দেশের মহৎ উপকার সাধন করুন এই আমি অন্তরের সহিত কামনা করি।

৪। শ্রীযুক্ত স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার ভূমিকা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম ও সঙ্গে সঙ্গে চমৎকৃত হইলাম। এ গ্রন্থ সম্বন্ধে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যথার্থই লিখিয়াছেন যে, গ্রন্থের বিপুলতার কথা ভাবিতে গেলে মনে সহজেই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে এই প্রকার বিপুল গ্রন্থ এক ব্যক্তির দ্বারা সংগৃহীত হইতে পারে কিনা। কিন্তু পুস্তক-লেখক ভূমিকায় স্বীয় অভিজ্ঞতার, ক্ষমতার ও অধ্যবসায়ের যে প্রকার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বিলক্ষণই আশা করা যাইতে পারে যে তিনি যথাসময়ে তাঁহার সঙ্কল্পিত কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবেক, ও সেই উদ্দেশ্যে, আমার বিবেচনায় কেবল বাঙ্গালা ভাষায় নয়, ইংরাজী ভাষাতেও পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের সকল বিভাগের লোকেরা পাঠ করিতে পারিবেক।

5. **Dr. Satish Chandra Banerji,** M. A. D. L.,
PREMCHAND ROYCHAND **Scholar.**

I entirely agree with you in thinking that the methods adopted for the study of languages in this country are defective. Your own plan seems to have been carefully thought out, and it has been admirably worked out. I have no doubt that by following your method our boys will be able to pick up English and Sanskrit much more quickly than they do at present.

6. **Babu Sarada Charan Mitra,** M. A. B. L.
PREMCHAND ROYCHAND Scholar.

I have gone through the books *Ingraji Siksha* and *Sanskrita Siksha* and *Prachin Greecer Jatiya Siksha* of your 'Siksha Bijnan Series' and am of opinion that they will be of great help to those for whom they are intended. I am glad you are doing a great service in the art of teaching.

৭। গৌড়দূত—শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ, বি, এল্,

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ, মহাশয় এক বিশাল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বাঙ্গালাভাষায় শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ কোন গ্রন্থ নাই বলিলে চলে। এদেশে জাতীয়ভাবে শিক্ষা প্রচার জন্য বিদ্যালয় ও পরিষৎ স্থাপিত হওয়ায় তাহার আবশ্যকতা দিন দিন অনুভূত হইতেছে। বিনয়বাবু স্বয়ং এই শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী,

সুতরাং তিনি এই বিশাল কার্য্যে ব্রতী হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। সম্প্রতি এই বিরাট গ্রন্থের ভূমিকামাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের বিশালতা দেখিয়া একা বিনয়বাবুর দ্বারা এই কার্য্য সংসাধিত হওয়া অনেকে অসাধ্য মনে করিতে পারেন, কিন্তু তিনি ছাত্রাবস্থা হইতে এই কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, এবং কেবল স্বয়ং প্রস্তুত নহে, অপর সহচর ও সাহায্যকারী ব্যক্তিও প্রস্তুত করিয়াছেন। সুতরাং এই বিশাল গ্রন্থের সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে আমাদিগের কোন সন্দেহ নাই।

8. **The Leader,** *Allahabad, 13th October, 1911*

Every lover of vernacular literature will welcome the nice little pamphlet 'The Man of Letters' from the pen of Prof. Benoy Kumar Sarkar, Lecturer in the Bengal National Council of Education. It sets forth in a forcible manner a scheme for the fostering of vernacular literature in India.

Prof. Sarkar holds that literature in common with everything else requires protection in its infancy. He says that our literature is still in its non-age and it is due to this backwardness and poverty of our language and literature that it has been only accorded a position of second language in the Government's scheme of higher education and has not been entitled to the dignity of the first language.

But this can be achieved if learned bodies like the Bangiya Sahitya Parishad of Calcutta and Nagri Pracharini Sabha of Benares undertake to employ some of the best students of our country to work together for the development of our literature under the guidance and control of such literary men as Dr. Seal of Bengal and Dr. Jha of our provinces. But to secure the services of these students it is essentially necessary that they should be free from all pecuniary wants.

The Bangiya Sahitya Parishad of Bengal took up the suggestion of Prof. Sarkar and on the occasion of the fiftieth birthday anniversary of Babu Rabindra Nath Tagore, the greatest living poet of Bengal, have collected a decent fund the proceeds of which will be utilised in the manner indicated above.

The Nagri Pracharini Sabha of Benares can do the same. The Sabha can raise funds on similar occasions and spend them likewise. If this can be done, perhaps it will not be then too much "to expect that in the course of ten years we can have the best literary treasures of the world in our own national literature, that we can have the thoughts and investigations of Plato, Herbert Spencer, Guizot, Hegel and other European philosophers through the

medium of our own language, and that in no time the education of these provinces can grow into one that is natural and really national."

৯। প্রতিভা—ঢাকা

বিজ্ঞানসম্মত সংস্কৃত শিক্ষাদান প্রণালীর প্রথম গ্রন্থাবলী। ইতিপূর্ব্বে আর এরূপ গ্রন্থ রচিত হয় নাই। মাতৃ-ভাষা শিক্ষা-প্রণালীর সাহায্যে প্রথম হইতেই বাক্যরচনা ও পদ-যোজনা লইয়া শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। শুদ্ধ বাক্যগুলি সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলে অশুদ্ধ বাক্যকে শুদ্ধ করিবার প্রয়াস করিতে হইবে। প্রথমতঃ কেবল শুদ্ধবাক্য প্রয়োগ করিয়া শিক্ষার্থীর কর্ণকে শুদ্ধ বাক্যের ধ্বনিতে অভ্যস্ত করিতে হইবে।

অধ্যাপক সরকারের প্রবর্ত্তিত পাঠ-সন্নিবেশের পারম্পর্য্য বিজ্ঞানসম্মত এবং আরোহ-প্রণালীর প্রয়োগমূলক। ব্যাকরণ শিক্ষা ব্যতিরেকে এই প্রণালীতে শিক্ষার্থী অতি সহজে সংস্কৃত অনুবাদ ও রচনা-পদ্ধতির এবং সাহিত্যের প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে।

পাঠগুলি এত সুন্দর ধারাবাহিকরূপে ও ব্যবহারিকভাবে বিন্যস্ত যে ব্যাকরণের অতি জটিল সূত্র-নিয়ন্ত্রিত এবং বিভক্তি-ও রূপ-বহুল সংস্কৃত ভাষা অতি সরলভাবে (এবং রূপ-ও-বিভক্তিহীন ভাষার ন্যায়) অনায়াসে আয়ত্ত হইতে পারে। ইহা গ্রন্থকারের বিশেষ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার পরিচায়ক।

সংস্কৃতশিক্ষার সৌকর্য্যসাধনে অধ্যাপক সরকারের পুস্তিকাবলী

তজ্জাতীয় আধুনিক গ্রন্থনিচয় অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট ও আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর কত উপযোগী তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই অনুভব করিতে পারিবেন। যুগধর্ম্মের ও সামাজিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং শিক্ষাদানের প্রাচীন প্রণালী বর্ত্তমানকালে আর প্রযোজ্য নহে। পণ্ডিতবর্গ ইহা বিবেচনা করিয়া অধ্যাপক সরকারের প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অনুসারে শিক্ষাকার্য্য সাধন করিবেন, ইহা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

গভর্ণমেণ্ট-প্রস্তাবিত প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষার উন্নতি বিষয়ে এই প্রণালী অবলম্বিত হইতে পারে কিনা তাহার বিচার হওয়া উচিত।

ইংরাজী শিক্ষা:—এরূপ গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় বিরল না হইলেও মাতৃভাষার সাহায্যে লিখিত ঈদৃশ গ্রন্থ সম্পূর্ণ নূতন। সংস্কৃত শিক্ষাদান প্রণালীর ন্যায় এগুলিও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রবর্ত্তক এবং ধারণা ও স্মৃতিশক্তির অপব্যবহার-নিবারক।

মৌখিক শিক্ষা হইতে শিক্ষার্থী ক্রমশঃ বাক্যের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারে অগ্রসর হইবে। ইতিমধ্যে আপন আপন বেষ্টনী মধ্যে প্রযোক্তব্য ইংরাজী শব্দ লইয়া ইংরেজী বাক্যে সেই সেই শব্দের ব্যবহার শিক্ষা করিতে হইবে। এইরূপে বিনা আয়াসে বিভিন্ন জাতীয় সাধারণ পদার্থের সহিত পরিচিত হইয়া শিক্ষার্থী সরলবাক্য রচনার কৌশল আয়ত্ত করিবে। মৌখিক শিক্ষাকালেই প্রশ্নোত্তর এবং আদেশ সম্বন্ধীয় বাক্যে শিক্ষার্থী অভ্যস্ত হইবে।

পাঠবিন্যাসগুলি ধারাবাহিক ও ক্রমিক। এই প্রণালীতে শিক্ষাদান করিলে স্বল্পায়াসে সুফল লাভ হইবে। প্রথমভাগের দ্বিতীয়

অনুশীলনে উচ্চারণ-বিষয়ক পাঠগুলি প্রথম শিক্ষার্থীর বিশেষ উপকারে আসিবে। দ্রষ্টব্যাংশগুলি গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতার পরিচায়ক এবং শিক্ষকের পক্ষে মূল্যবান্।

10. Empire—23rd September, 1911.

All students of Sanskrit language and literature should note the improvements made by Professor Sarkar, and educational authorities may see their way to give a **fair trial to his method** of teaching in the schools under their jurisdiction.

The author's "Prachin Greecer Jatiya Siksha' is in some respects a unique production in Bengali. It contains an excellent introduction to the science of education. Then follows an account of the systems of education which obtained in Sparta and Athens. In the concluding chapter ancient Greece and India have been compared from several points of view.

Professor Sarkar's volume is an **important contribution to Bengali literature** and should be bought in hundreds. We understand that all profits arising out of the sale of this book will go to the funds of the Bangiya Sahitya Parishad, the leading literary society of Calcutta.

১১। হিতবাদী—১৭ই আশ্বিন, ১৩১৭ সাল

এ পুস্তকের আলোচনাপদ্ধতি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। অধ্যাপক ও বিদ্যার্থিবর্গের মধ্যে ইহার আদর হইবে।

12. The Bengalee, September, *1910.*

A MONUMENTAL WORK.

"*Shiksha Bijnaner Bhumica*" or Introduction to the Science of Education contains an appreciative preface by **Babu Hirendranath Datta,** is to be a *comprehensive* work treating of all the aspects of education, *historical*, *theoretical* and *practical*.

*　　*　　*　　*　　*

It is highly desirable that the **New Method of Teaching** inaugurated in his work should find its trial in our Public Schools and Colleges.

Government is also alive to the cause of primary education. It is evident that we are in need of a number of educated men, like the present author, who can devote their lives to lift and leaven the general mass of the community.

Slur is often flung at our graduates that they are not fit for any original work. We invite the public to take note of this comprehensive and **original work** on the Science of Education and to see if they can adopt its ideals and methods of education.

The author deserves the most hearty thanks from the public for the long and steady efforts that are being made to the **cause of educational reform.**

১৩। প্রবাসী—ভাদ্র ১৩১৭

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ভূমিকায় এই গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন—শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থকার এক প্রকাণ্ড পুস্তক কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত করিবেন, তাহাতে শিক্ষাপদ্ধতির ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর আলোচনা থাকিবে। সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যদেশের শিক্ষাপ্রণালীর তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়া শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থির করিবার চেষ্টা হইবে। শিক্ষার অন্তর্গত জগতের যাবতীয় বিষয় আলোচিত হইবে। সেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের সারমর্ম্ম প্রকাশ করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

গ্রন্থকার বিদ্বান্ ও শিক্ষাকর্ম্মে ব্যাপৃত। তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে আশা করা যায়। পুস্তিকার শেষে গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা দেশ-হিতেচ্ছুর চিন্তা ও অনুকরণের যোগ্য বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—"শীঘ্রই বিদ্যাদান এবং শিক্ষাবিস্তারই স্বদেশসেবা ও সমাজ-হিতের প্রধান অঙ্গ ও লক্ষণ হইয়া দেশের মধ্যে বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবে। শিক্ষার আন্দোলনই সকল আন্দোলনকে গ্রাস করিয়া ক্রমশঃ গভীরতর ও বিস্তৃততর হইতে থাকিবে। কর্ম্মিগণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব-বিকাশের সহায়ক জ্ঞানমন্দিরসমূহের প্রতিষ্ঠাকেই জীবনের ধর্ম্ম মনে করি-বেন এবং এই কর্ম্মেই সম্পূর্ণ শক্তি ও সময় দান করিয়া জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন। শিক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য দেশবাসীদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। শিক্ষাপ্রচারই

সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের নূতন সন্ন্যাস হইবে। শিক্ষকই নূতন সন্ন্যাসী হইবেন। এরূপ সন্ন্যাসী দেশে দেখা দিয়াছেন।"

১৪। বসুমতী—ভাদ্র ১৩১৭

গ্রন্থকার "শিক্ষাবিজ্ঞান" নামক বিশখণ্ডে সমাপ্ত যে বিরাট গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই ভূমিকা তাহারই পরিচয় ও নির্ঘণ্টস্বরূপ লিখিত হইয়াছে। শিক্ষা-বিজ্ঞান গ্রন্থ বঙ্গভাষায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

গ্রন্থকার মাতৃভাষায় এই অভাব দূর করিবার জন্য তিন চারি বৎসর কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শিক্ষাবিজ্ঞানের রচনা করিয়াছেন। সেজন্য তিনি সাধারণের ধন্যবাদার্হ। সংস্কৃত, ইংরাজী, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত চারি পাঁচখানি পুস্তক ইতিমধ্যেই যন্ত্রস্থ হইয়াছে।

এই রাজনৈতিক আন্দোলনের দিনে শিক্ষাবিজ্ঞানের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া নবীন গ্রন্থকার শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছেন। হীরেন্দ্রবাবুর সহিত আমরাও বলি—সুধীমণ্ডলী এই নূতন গ্রন্থের উপযুক্ত সমাদর করিবেন এবং শিক্ষাবিষয়ে নিজ নিজ চেষ্টা ও চিন্তার প্রয়োগ করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃত "বিজ্ঞানের" প্রতিষ্ঠা করিবেন।

১৫। ভারতী—কার্ত্তিক ১৩১৭

ভূমিকায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় গ্রন্থকারের যোগ্যতা, অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এ মহৎ অনুষ্ঠানের সফলতা সম্বন্ধে সবিশেষ আশান্বিত, আমরাও তদ্রূপ

আশান্বিত। গ্রন্থকার শিক্ষাব্রতে আপনার সকল চিন্তা, সকল চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন, শিক্ষাদান কার্য্যে তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, সমগ্র ভারতবাসীর শ্রদ্ধাভাজন। শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকাপাঠে গ্রন্থকারের শক্তি সম্বন্ধে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না। এমন পাণ্ডিত্য ও তাহার সদ্ব্যবহার আজিকালকার এ স্বার্থের যুগে দুর্লভ, প্রাচীন ভারতের কথা মনে পড়ে। বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে এই গ্রন্থ বিরাজ করুক, শিক্ষার প্রকৃষ্টতর আদর্শে বাঙ্গালী উন্নতির পথে উঠিবে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

16 **The Modern Review**—*October, 1910.*

The author is engaged in the preparation of a 'Science of Education Series' which will be completed in twenty parts. The book under review is an introduction to the whole series. The author deserves our best thanks for the services he is doing to the cause of **Educational Reform** in our country, and we recommend this introduction to our teachers for perusal.

১৭। আর্য্যাবর্ত্ত—কার্ত্তিক ১৩১৭

আমাদের সমালোচ্য ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি অতি প্রকাণ্ড বিষয়ের পূর্ব্বভাষ বা অবতরণিকা। তিনি যে জীবনব্যাপী মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, ভূমিকায় তাহারই উদ্বোধন হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষায় কেন, বোধহয় পৃথিবীর কোন ভাষায় শিক্ষা-বিজ্ঞানের এমন বিপুল আয়োজন একজনের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। স্পেন্সার তাঁহার ক্রমোন্নতিদর্শনে, কোমত্ তাঁহার বিজ্ঞান-শ্রেণী-বিভাগে যে একটা ভাবসমগ্রতা প্রদর্শন

করিয়াছেন, তাহাও এ শ্রেণীর সমগ্রতা নহে। 'শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা' প্রণেতা যে সমগ্রতাকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইলে বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও জীবনব্যাপিনী সাধনার প্রয়োজন; জীবনব্যাপিনী সাধনারও সিদ্ধিলাভ করা যায় কিনা সন্দেহ। ভূমিকায় ভূমিকালেখক হীরেন্দ্রবাবুও সে আভাস দিয়াছেন। অবশ্য শিক্ষাবিজ্ঞানের গ্রন্থকারের এই বিপুলতার জন্য সঙ্কুচিত হইবার প্রয়োজন নাই।

সমস্ত জড়বিজ্ঞান ও সমস্ত অধ্যাত্মবিজ্ঞানই মানব-মনের সহিত অতি ঘনিষ্টভাবে জড়িত। বর্ত্তমান যুগে মানবের শিক্ষায় এই সমস্ত বিজ্ঞানেরই যথানির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। এই কথাটি বিস্মৃত হইলে শিক্ষায় সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করা কখনও সম্ভবপর হয় না। শিক্ষা-বিজ্ঞান-আলোচনা-প্রয়াসী অধ্যাপক মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে এই নূতন তত্ত্বের অবতারণা করিয়া, এই পূর্ণ আদর্শটি সাধারণের সমক্ষে ধারণ করিয়া বড় ভাল কায করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার পরিধি এখনও সঙ্কীর্ণ, আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী এখনও অতীতের জড়ত্ব পরিহার করিতে পারে নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এখন সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার অনুকূল নহে; কিন্তু তাহা হইলেও এ আদর্শটি মহান্, সুন্দর এবং সার্থক, সুতরাং অবশ্যম্ভাবী বিঘ্ন সত্ত্বেও আমরা নবীন লেখকের উদ্যমের সফলতা কামনা করি। * * *

বিষয়ের গুরুত্বতুলনায় ভূমিকাটি নিতান্ত ক্ষুদ্র; তাহা হইলেও লেখক যেরূপভাবে তাঁহার বক্ষ্যমান বিষয়ের আভাস দিয়াছেন, তাহা হইতেই তদীয় আরব্ধ ব্যাপারটীর ব্যাপকতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। গ্রন্থকারের উপর আমাদের নির্ভর ও বিশ্বাস আছে, তাঁহার ক্ষমতারও আমরা পরিচয় পাইয়াছি। আমাদের কামনা, তিনি নিজব্রতে সফলতা লাভ করিয়া জাতীয় সাহিত্যের ও জাতীয় শিক্ষার ভাণ্ডার পূর্ণ করুন।

18. THE HINDUSTHAN REVIEW—Allahabad.

Professor Benoy Kumar Sarkar's *Economics* in his *Aids to General Culture Series* an exposition of the science as conceived in Europe from Adam Smith to Marshall, but the last chapter "*The Meaning of Indian Economics—Different standpoints*" is bound to prove not only interesting but instructive to students in the country. In this the author gives a lucid summary of the different standpoints from which the subject may be studied.

He distinguishes between what passes for Indian Economics in the curriculum of our study of our present-day facts and phenomena relating to the industrial, financial and commercial organisation of the society and the position the subject should have as a contribution to the universal science of Economics, which is yet in the making according to the principles of the inductive-philosophical method. According to thisview Indian Economics *as an applied science* should mean not an Economic History as set forth by Mr. Romesh Dutt or a summary of what is available in the Economic and Administrative sections of the *Imperial Gazetteer of India*, but a study of the methods and means of the socio-economic and economico-political advancement of India.